দিন বদল

মিহির আচার্য

অগ্রণী প্রকাশনী

প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী প্রকাশনী
১৩ শিবনারায়ণ দাশ লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
অনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়
চলন্তিকা প্রেস
২ রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড
কলিকাতা ২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২/১ কলেজ স্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৭

দাম দু' টাকা

এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মারফত বিগত দু'একবছরের বাংলার জীবনের সামগ্রিক চেহারাকে আঁকবার চেষ্টা করেছি। উপন্যাসের সার্থকতা কিম্বা অসার্থকতা আমার বক্তব্যের বাস্তব রূপায়নের উপর নির্ভর করবে। এবং এই বিচারের মাপকাঠি একমাত্র পাঠকদের হাতেই।

কলকাতা

৪ মাঘ ১৩৫৭

মিহির আচার্য

শ্রীশিশিরকুমার আচার্য

জ্যেষ্ঠেষু

পদ্মরানীর, বাপের বাড়িতে চালের দর উঠেছিল চল্লিশটাকা। পাকিস্তানের এক গ্রামে ওর বাপের বাড়ি। এলাহি সংসার। দিনে-রাতে অনেক পাতা পড়তো। বাপ কাকা জ্যেঠা—কাকী জ্যেঠী থেকে ছেলেপিলেদের ছোট বড়ো মাঝারি সংস্করণ। বাড়ির লোক দিয়ে ছোটখাটো একটা বরপক্ষ কনেপক্ষের অভিনয় করানো চলতে পারতো। সংসারে যতোগুলো মুখ ছিলো, ততোগুলো খাটবার হাত ছিলো না। ফলে কণ্ট্রোলের কাপড় দিয়ে সর্বাংগে ঢাকা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার মতো ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোতো না। কাজে কাজেই ছেলেপিলেরা ফেলে-খেলে আগাছার মতো মানুষ হতো। মেয়েদের অবস্থাটাই চরম! এমন পরিবারে 'ধাড়ি মেয়ে ধুমসি মেয়ে' হয়ে কিছুদিন থাকাটা অশোভন, আপত্তিজনকই নয় শুধু, অপরাধ! আঠারো বছরের ধুমসি হবার অপরাধে অনেক গঞ্জনার শিলাবৃষ্টি অহল্যার মতো মুখ-বেঁধে সয়ে যেতে হতো ওকে, যদি না বিয়ের প্রথম হাটেই ও চল্‌তি পণ্যের মতো বিকিয়ে যেতো। দেখতে সে বাংলাদেশের আরো দশটি মেয়ের মতোই রূপে-গুনে সীতা-সাবিত্রী, বেহুলা কুন্তি, দ্রৌপদী অহল্যার তুলনামূলক উদাহরণ হতে পারে।

স্বর্ণ-বস্ত্রে নিজের ওজন ভারি করে, চওড়া-করা সিঁথেয় সিঁদুর আর আধ-হাত ঘোমটা টেনে পদ্মরানী প্রথম শ্বশুর বাড়িতে এসে উঠলো। ঘোমটা সরিয়ে, ফুলশয্যের বাসিফুল ঝেঁটিয়ে ফেলে, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বাস্তবের সংগে মুখোমুখী পরিচয় হলো ওর।

চালের দর নাকি এখানেও আটত্রিশ টাকা! এই হিন্দুস্থানেও!

নতুন বউ, টাটকা গন্ধ মিলোয়নি—সবে বিয়ের উচ্ছাস লাগলো দেহতটে, কলহাস্যে ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে থাকবে কোথায়, তা না, চালের দর যেন ওর বিয়ের, দ্বৈতজীবনের, সব কিছু রোমাঞ্চ আর আকর্ষণের আলোকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলো। অভিজ্ঞতায় কাঁচা হলেও, বিয়েকে শুধু স্বামী সোহাগের একটা কাল্পনিক স্বর্গ বলে মেনে নিতে পারেনি ও। মেয়েদের জীবনে বিবাহটা শুধু ঘর পরিবর্তন, আবেষ্টনী বদলানো, তাছাড়া অভিনব কিছু নয়! তাছাড়াও বাড়িতে কাকী জ্যেঠীর স্বামীর সংসারের বঞ্চনার পরিহাস সব কিছু ওর মনে গেঁথে আছে।

ঘটনাক্রমে ছেলেবেলার এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেলো পদ্মর।

কুমারী জীবনের এক কলংক-করুণ অধ্যায়! বয়েস আর কতই হবে—এগারো কী বারো। আঁটোসাঁটো ফ্রকে ওর দেহকে আর কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। অথচ কাপড় মেলা ভার! কাকা-কাকীদের চোখের সামনে হঠাৎ পরিবর্তিত এই শরীর নিয়ে বার হতে কেমন সংকোচে জড়িয়ে যেতো ও। এক বুক লজ্জা মন্থর করে ফেলতো, নিয়ন্ত্রিত করে ফেলতো ওর চলাফেরাকে। সেই সময়কার কুমারী জীবনের এক নির্বোধ অথচ সত্য কাহিনী!...একদিন দুদিন তিনদিন—সে যে কি এক অভিশপ্ত দিনগুলি অনশন অনাহারে বিবর্ণ, কুঁকড়ে-যাওয়া। এটা শুধু তাদের পরিবারগত চেহারা নয়, সমস্ত গাঁয়ে তখন অভাব অনটনের মড়ক পড়েছে। এক বাটি মুড়ি বরাতজোরে—নির্দিষ্ট বরাদ্দ, তাছাড়া রয়েছে জল, অঢেল, অজস্র। দিনের পর দিন এমনি করে চেপে রাখা ক্ষুধাকে, পীড়িত অবশ করে ফেলা মনকে! পদ্ম পাগল হয়ে উঠেছিল। ছোটবেলায় আনন্দমঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা পড়েছিলো ও, সে-ক্ষুধার জ্বালা যে কতো নিদারুন আর অগ্নিবর্ষী হতে পারে তা যেন সেবার মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলো ও। পদ্ম পারেনি নিজেকে দমিয়ে রাখতে, দেহের আগুনকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারেনি। সন্ধ্যের সময়ে অন্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ও—ক্ষুধা

ওকে স্বার্থপর, মরীয়া করে তুলেছিলো। সোজা চলে এসেছিলো মদনদার কাছে। মদন বর্মন—জোতদার শ্রীনাথের ছেলে। ছুটিতে কলেজ থেকে এসেছে। খিড়কীর পুকুরে কতোদিন ডুবে-ডুবে চোর-চোর খেলেছে ওরা, খাটের তলে লুকিয়ে কতোদিন সেজেছে বউ-বর, কতো হালকা রং তামাসা। সেই পুরানো খেলারসাথীর দাবীতে মদনদার ঘরে গিয়ে উঠলো।

খাটের ওপর বসে মদনদা কী একটা বই পড়ছিলো।

'আরে! কখন এলি?' ঝিকিয়ে উঠেছে মদনদার চোখ। সে চোখের দৃষ্টিতে কিসের লোভ ঝলসে উঠেছিলো—তা বোঝবার বয়েস হয়েছিলো পদ্মর। কিম্বা পুরুষের মনের চেহারা জানবার ক্ষমতা মেয়েদের সহজাত।

আঁটসাঁটো ফ্রকের বাঁধনে আটকানো নিজের শরীরের পানে অপলকে চেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠেছিলো পদ্ম, সেই মুহূর্তে ছুটে পালাতে চাইছিলো, কিন্তু সারা দেহ মন যেন ওর অবশ হয়ে গিয়েছিলো।

মদন এসে হাত ধরতে কেঁদে উঠেছিলো ও। মদনদা খাটের ওপরে কোলের কাছে টেনে এনেছিলো ওকে। সেদিনের সেই শান্ত ছেলেটা যে এতো উত্তেজিত, এতো স্খলিত হতে পারে ভাবতেও পারেনি ও।

'লক্ষিটি তোমার পায়ে পড়ি মদনদা—অমন কোরো না'—কঁকিয়ে উঠেছে পদ্ম। বুকের ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে ওর। সাপের বিষের মতো কী রকম একটা তীব্র জ্বালা জানান দিচ্ছে উদরের মধ্যে।

'যাঃ বোকা মেয়ে—' গাল টিপে দিয়েছিলো মদন: 'কাঁদছিস কেন—কী হয়েছে?'

'কিছু খেতে দেবে মদনদা—তিনদিন থেকে'...পদ্মর জিভ শুকিয়ে যায় কাগজের মতো, মাঝপথে কথা আটকে যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আজ চোখের সামনে। খেতে চাই—খেতে চাই—

'তিন দিন থেকে খাসনি তুই পদি! আমাদের বাড়িতে আসিসনি কেন?'

পদ্ম হাসলো। গোরুর মতো ড্যাবডেবে চাউনি মেলে ধরলো মদনের সামনে।

মদন শিউরে উঠেছিলো বোধহয় অন্তরে একটু। বললে, 'বোস—আমি খাবার নিয়ে আসছি—'

কিন্তু সেইখানেই সব শেষ নয়। চাষী শোষণ-রপ্ত, তিল তিল করে জোঁকের মতো হিসেবী জোতদারী শোণিত মদনের শিরায়-শিরায়। খাবারের বদলে মদনেরও তো কিছু দাবী-দাওয়া থাকতে পারে। বিনা পয়সায় এতো সহজে কে খাবার দেয় বুভুক্ষুকে? খাবারের মাশুলের কথা ছেড়ে দিলেও, পুরানো সাথীত্বের অধিকারও তো আছে, অকৃতজ্ঞ তো নয় যদি, বিনিময়ে মদনকে কিছুক্ষণ তৃপ্তি আর ফুর্তির যোগান দিতে এমন কী লোকশান, কী এমন ক্ষয়ে যাবে ওর? ভারি তো!

...সে-এক কালো-বীভৎস রাত্রির স্মৃতি।

'চালের দর এখানেও আটত্রিশ টাকা!' আপন মনে উচ্চারণ করে পদ্ম আর দুশ্চিন্তার ছায়া নামে ওর মনের প্রান্তে। বিগত এক সন্ধ্যার ধূসর পৃষ্ঠা যেন কালো নিশানের মতো দুলতে থাকে ওর চোখের সামনে। ক্ষুধাকে ওর বড়ো ভয়, ক্ষুধা দুর্বল করে ফেলে, ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে মানুষকে। ক্ষুধা মেয়েদের জীবনে, পদ্মের জীবনের চিরশত্রু! ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করবে ও—আর কোনো দিন ক্ষুধার পায়ে যেন জীবনকে বিকিয়ে না দিতে হয়। তার মন থেকে এক টুকরো কালির ছাপকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে চায় ও। কিন্তু চাল এখানেও...?

অনেক আশা আর উজ্জ্বল সম্ভাবনা বুকে নিয়ে পদ্ম স্বামীর ঘর করতে এসেছিলো। কিন্তু রূঢ় বাস্তব যেন তার স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো, কুৎসিৎ ভাবে পরিহাস করে উঠলো তাকে।

শ্বশুর বাড়ির প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাগুলো সংক্ষেপে এই :

...বাসর ঘর।

একটা পেট্রোমাক্স সোঁ সোঁ করে জ্বলছে। আগুনের লোভে কতো-গুলো পোকা গুঞ্জন তুলেছে আলোকে ঘিরে।

গুটিসুটি হয়ে ঘরের মাঝখানে বসে রয়েছে ও। ওকে ঘিরে পাড়া-পড়শী অচেনা মেয়েদের ভিড়। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কুতূহলী দৃষ্টি নতুন বউকে দেখবার চেষ্টা করছে। আলাপ জমাবার প্রস্তুতি তুলেছে কয়েকজনে গায়ে পড়েই। কয়েকজন স্থূল অনুসন্ধিৎসু বউয়ের ট্রাঙ্ক খুলে ওলোটপালোট করে দেখছে। একজন খুঁত খুঁতে বউ ওকে নেড়ে চেড়ে নিচের হাতের আর কানের গয়নাগুলো পরখ করছে।

একঘেয়ে বসে থেকে মাথা ঝিম মেরে যাচ্ছে পদ্মর। দুস্তর ট্রেণের ধকল সারা দিন গেছে গায়ের ওপর দিয়ে, স্নায়ুগুলো ঢিলে হয়ে আসছে। এক ঘর পাহারার যদি কিছুটা ফিকে হয়ে আসতো, তাহলে এখানেই একটু গড়িয়ে নিতো। কিন্তু...

বরের দিদিমা ঘরে এসে ঢুকলো। 'ইস, তোরা একটু সর তো। গরমে যে মেয়েটা সেদ্ধ হতে বসেছে!'

দিদিমা পদ্মর হাত ধরে তুললো। 'ওঠো তো বউমা—তোমার শ্বশুরকে একবার প্রণাম করে আসবে—'

পায়ে-পায়ে এগোলো নতুন বউ।

দক্ষিণের কোণে শ্বশুরের ঘর। চৌকাঠের বাইরে থমকে দাঁড়ালো পদ্ম। ঘরের এক কোণে ছোট্ট রেড়ির তেলের পিদিম ধোঁয়া উদ্গীরণ করে জ্বলছে। ঐ আলোতে ঘরের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। কেমন অস্পষ্ট, ভুতুড়ে-ভুতুড়ে মনে হচ্ছে ঘরটাকে। মাথা ঘুরতে থাকে পদ্মর।

ঘরে জনপ্রাণীর সাড়া পেয়ে ত্বরিতে চৌকী থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রৌঢ় শ্বশুর।

'কে ? কে ? কে— ?' গলার স্বর চোখা করে চিঁচি করে চেঁচিয়ে উঠেছে শ্বশুর। চমকে উঠে দিদিমাকে আঁকড়ে ধরলো নতুন বউ।

এ কী চোখের দৃষ্টি মানুষটার ? ফ্যাকাশে, রুগ্ন আর বুনো। কাঁচাপাকা চুল, হ্রস্ব দেহ প্রৌঢ়, হাঁটুর ওপর খাটো করে তোলা কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, শিরাবহুল লোমশ হাত, খোঁচা খোঁচা দাড়ি—রুক্ষ কর্কশ।

কাঁপছে পদ্ম। লোকটা অমন করে তাকাচ্ছে কেন ওর দিকে ? ভাষা-হীন বিকৃত।

'বউমা—প্রণাম করো—'

কয়েক পা এগিয়ে নত হয়ে প্রণাম করতে গেলো ও, কিন্তু ছিটকে পিছিয়ে গেলো শ্বশুর কয়েক পা। কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'চলে যাও—চলে যাও—আমাকে ছুঁয়ো না—'

আহত পদ্ম কেঁদে ফেললো অসহায় ভাবে।

দিদিমা নিজেই এবার অগ্রসরী ভূমিকা নিলো: 'দ্বিজনাথ—বউমা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে—'

আপনমনে এলোমেলো হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে শ্বশুর: 'উঃ—ওরা আমাকে মেরে ফেললে—মেরে ফেললে। শত্তুর। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—'

দিদিমা আর সাহস করলো না।

'চলে এসো বউমা—' বউকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দিদিমা। আবার ঘরে এসে বসলো নতুন বউ। থরথর করে কাঁপছে ওর পা দুটো, বুকের ভেতরে হিম ধরে গেছে, দিদিমা ধরে না বসালে হয়তো তখনি পড়ে যেতো ও।

ধকধক করে উত্তেজিত হৃদপিণ্ডটা বেজে চলেছে।

কী হলো—একী হলো পদ্মর ? সমস্ত কল্পনাই যেন খানখান হয়ে ঠুনকো পেয়ালার মতো ভেঙে পড়ছে। এই কী বহুবাঞ্ছিত স্বামীর

সংসার! এরই বিচিত্র অসামঞ্জস্যতা মনে মনে লালন করে মেয়েরা, এই-ই মেয়েদের দ্বিতীয় জীবন!

ওর শ্বশুর উন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক? কই, এ কথা তো আগে শোনেনি ও। মানুষ পাগল হয় কেন? বিস্বাদ আর বিতৃষ্ণার মধ্যে থেকেও কেমন একটা উৎসুক জিজ্ঞাসা চাড়া দিয়ে উঠছে ওর মনে। গাঁয়ে থাকতে একবার এক পাগলকে দেখেছিলো ও। উসকো খুসকো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ির অরণ্য, গাময় খড়ি উড়ছে, কোমরে বাঁধা এক টুকরো ছেঁড়া কম্বল, অস্বাভাবিক ধূসর চোখের ভাষা। হাতের মধ্যে একটা দড়ি নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বীরদর্পে পথ মাড়িয়ে ছুটতো ও। থেকে-থেকে বেয়াড়াভাবে চীৎকার করে উঠতো: 'সব পুড়ে যাবে, জ্বলে যাবে, ছাই হয়ে যাবে।'...আচ্ছা, পাগলের কথার কী কোনো মানে আছে? লোকে পাগল হয় কেন?

কিন্তু, তবু, ওর শ্বশুরকে তো সাধারণ পাগল বলে মনে হচ্ছে না। কেমন ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ বিতৃষ্ণা ওর চোখে মুখে, কেমন সর্বস্ব খুয়ে-যাওয়া শূন্য ভোঁতা অভিব্যক্তি!

দোরে পদশব্দ।

চোখ ফেরালো পদ্ম।

ফর্শা ছিপছিপে রোগা এক যুবক। হাফসার্ট গায়ে। মাথার লম্বাটে চুলগুলো এলোমেলো, শ্রান্ত চোখ দুটো কৌতুকতায় চকচক করছে, ঘামে ভিজে গেছে ওর সারা মুখ। অদ্ভুত কোমল আর কী রকম শান্ত দৃষ্টি!

সোজা এসে যুবক নতুন বউয়ের কাছে আসন পেতে বসলো।

লজ্জায় রাঙিয়ে উঠলো পদ্ম।

'এই দেখুন দিকি—আমাকে দেখে লজ্জা পাবার কী আছে! আমি কমল—ঠাকুরপো...'

ঠাকুরপো! কুতূহলের আগুনে জ্বলে উঠলো পদ্মর চোখের তারা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এই সাধারণ মানুষটার দিকে চুরি করে তাকাবার লোভ সামলাতে পারলো না ও। এতো সহজ আর সাদাসিধে ওর ঠাকুরপো! কোনো অপরিচয়ের কষ্ট কুণ্ঠা জড়ানো নেই ব্যবহারে, এটা যেন একটা সাদামাটা ব্যাপার। ভালো লাগলো পদ্মর কমলকে। উন্মাদ শ্বশুরের চিন্তা এতোক্ষণ বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলো ওর মনকে, এই হতাশার সমুদ্রের মধ্যে কমলের চোখে যেন পথের আলো খুঁজে পেলো। এখুনিই ওর সংগে কথা বলবার আকাংখা পেয়ে বসছে পদ্মর। কিন্তু ছি, লোকে কী বলবে! নতুন বউয়ের অতো তাড়াতাড়ি মুখ খোলা উচিত নয়! লোকে বেহায়া বলবে না, বলবে না, 'ওমা কী ধিঙ্গি মেয়ে নিয়ে এসেছে—প্রথম রাত্রেই মেমসাহেবের মতো হাসি মস্করা!'...

কমল বললে, 'বেশ! কথা না বললে আমার ব'য়ে গেছে আলাপ করতে। আমি উঠলাম—'

পদ্ম আর পারলো না। আঁচলে মুখ গুঁজে এবার ফুলে-ফুলে নিঃশব্দে হেসে উঠলো ও। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে উঠলো ওর শরীর অবরুদ্ধ হাসির দমকে।

কমল বুঝলো, মেয়েটিকে যতো বোকা ঠাউরেছিলো, তা নয়! কথা বলবে না, অথচ দুষ্টুমি করে হাসবার বেলায় ঠিক আছে।

কমল উঠে দাঁড়ালো। 'আচ্ছা—এর শোধ নেবো। সম্প্রতি পেটে আমার দুর্ভিক্ষ। খেয়ে আসি—'

রাত্রি ঘনায়িত হয়ে এলো।

উৎসবের কোলাহলের স্রোত মন্দা হয়ে এসেছে। কলহাস্য-মুখর বাড়িটা সারাদিন উত্তেজনার পর যেন ঝিমোতে আরম্ভ করেছে। উৎসব মাত্রের

আয়ুই বোধ হয় এ রকম ক্ষীণ! খাওয়া-দাওয়া সেরে পাড়া-পড়শীর ঝাঁক আর আত্মীয়ের দল বিদায় নিয়েছে। নতুন বউয়ের খাওয়া শেষ হয়েছে।

একলা ঘর। নিঃসংগতার অবসাদ নেমেছে পদ্মর। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে চায়।

স্বামী পান চিবোতে চিবোতে ঘরে এসে ঢুকলো। সারাদিন ধৈর্যহীন অপেক্ষার পর যেন এই খনটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলো ও। ত্রিশ বছরের একটানা ছ্যাকরা গাড়ির জীবন·· বিস্বাদ! নয়া আস্বাদনের মধ্যে মুখ বদলানো যাবে। সারাক্ষণ শুধু এই দুর্লভ অবসরটির জন্যে ক্ষুধার্ত ভিখিরীর মতো ওঁৎ পেতে ছিলো ও।

মনে পড়ছে: সেদিনও পর্যন্ত কী ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। বিবাহ মানেই— 'পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা!' ঐ ভুয়ো মাকড়সার জালে জীবনকে লেপটে একশা করবে না ও। নেভার!···কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিয়েটা যখন চোখকান বুজে ক'রে ফেললো—মনে হলো ঠকেনি। বয়েসের একটা তীক্ষ্ণ বোধ কতোদিন, কতো বিনিদ্র রাতে ছুরির মতো খচখচ করে উঠেছে রক্তের মধ্যে। অভাবের একটা ভোঁতা পিপাসা কতোবার বুক থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। নাঃ—আজ সত্যিই বিশ্বাস হয়েছে ওর—যা স্বাভাবিক তাকে সহজে মেনে নেয়াই ভালো, আত্মপীড়ন একটা প্রকাণ্ড বঞ্চনা, দীনতা।

স্বামীকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলো পদ্ম।

বাতির আলোকে আজ এখুনিই যেন স্বামীকে গোটাভাবে চিনতে পারলো ও। হাসলো পদ্ম। দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠলো ওর।

নধর আকৃতির সুস্থ সবল যোয়ান। আত্মম্ভরিতায় মুখটা বড়ো রূঢ় আর কঠিন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা সুরুচির বিজ্ঞাপন দেবার সযত্ন প্রয়াস। কুচকুচে মাথা-ভরা চুলগুলো পরিপাটির সংগে ওলটানো, জোড়া ভুরু, কেয়ারী করে ছাঁটা গোঁফ। মুখের হাসিটা পর্যন্ত মাপজোক করা।

দরজার খিল এঁটে দিলো বলাই। বউয়ের পাশে ঘনিষ্ট হয়ে একটা বালিশ টেনে বসলো।

'ঘুম পায়নি তোমার?' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে হেসে জিগ্যেস করলো বলাই।

হাসলো পদ্ম। একটু সরে স্বামীকে শোবার জায়গা দিলো। কোনো জবাব দিলো না। লজ্জায় নয়, শ্রান্তিতে।

বলাই বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মর দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ রোমাঞ্চ আনছে ওর বুকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোতে, চুল-চেরা পরীক্ষা করে বউকে দেখতে ইচ্ছে করে বলাইয়ের। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস এই মেয়েমানুষের দেহ!

বলায়ের চোখে নেশা ধরায়।

পদ্ম ঘুমিয়ে পড়েনি। চোখ বুঁজে আছে। ঘোমটা খশে পড়েছে মাথা থেকে, লাল ফিতেয় জড়ানো চুলের বিনুনি আল্‌গা হয়ে বালিশের নিচে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পরনের শাড়িটা বিস্রস্ত হয়ে কোনো-রকমে জড়িয়ে আছে ক্লান্ত শরীরটাকে, লাল জামাটার অনেকখানি অংশ একরাশ লাল জবার মতো অনাবৃত হয়ে পড়েছে। পদ্মর ভেতরটা কাঁপতে আরম্ভ করেছে এক নিরাবয়ব ভয়ে। চোখ খুলতে গা শিরশির করছে ওর। অনুমানে বুঝতে পারছে কী নিবিড় লালসা পুড়িয়ে ইন্ধন করে ফেলেছে লোকটার চোখদুটো। পুরুষ জাতটাই কী এমন শোষক?

'কী ঘুমোলে নাকি?' বলাইয়ের ঘামেভেজা হাত গালের ওপর এসে পড়েছে পদ্মর।

পদ্মর সত্যিই ভীষন ঘুম পাচ্ছে।

বলাই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। মশারিটা ঝেড়ে টেনে দিলো। বিছানায় বসে হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কী প্রার্থনা জানালো।

কেবল অস্পষ্টতার মধ্যে 'জয় মা কালী, মঙ্গলচণ্ডী'র স্তবটুকু শোনা গেলো।

'শুনছো—ওগো—শিগ্ গির ওঠো—' হঠাৎ ভয়ার্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো চাপাস্বরে বলাই।

ধড়মড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো পদ্ম।

'কী করেছো! কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওই দিকে পা করে শুয়েছো মাথার ওপরে মা কালীর পট নেই!'

তাইতো! পদ্ম বালিশটা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে শুলো।

জানলা দিয়ে জ্যোছনা ভেঙে পড়েছে ঘরের মধ্যে, বিছানার মধ্যে, ওদের গায়ের ওপর। নির্লজ্জ জ্যোৎস্নার দিকে চাইতে পারছে না পদ্ম —এনিমিয়া রুগীর মতো যেন হাসছে সে। ঘরের ভেতরেও চোখ মেলতে পারছে না—জ্যোৎস্নায় মিশে একাকার হয়ে স্বামীর চেহারাটা যেন রক্তশোষক শ্বাপদের মতো দেখাচ্ছে। বীভৎস! সব পুরুষই কী মদনদা! কষ্টে চিন্তা করে ওঠে পদ্ম : মদনদার সংগে ওর স্বামীর তফাত কোথায়!

কমলের মস্তিষ্কের মধ্যে এক বিরাট অর্কেস্ট্রা পার্টির আসর বসে গেছে। একমাসের অস্থির কর্মচঞ্চল মুহূর্তগুলোর প্রতিক্রিয়া।

…দত্ত বেকারীর কারখানায় ধর্মঘট।

'জোরালো করে একটা লিফ্‌লেট লিখে দেন—' কমরেড সিদ্দিকের হুকুমনামা।

'কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে খবর কাগজের রিপোর্টটা লিখে ফেলো—' ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টের জরুরি তাগিদ।

তথাস্তু। ইস্তাহার তৈরী করা থেকে প্রুফ দেখা সব এক হাতেই করতে হয়েছে। তাও এক মুহূর্ত থামবার উপায় আছে কী! কমরেড সিদ্দিক ছুটে ছুটে আসছে: 'কই হলো?' ওর ইচ্ছে একটা প্রুফেই যা উঠেছে, তাই ছাপিয়ে বার করা! কম্পোজিশনের গলতিকে ও ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না! গলায় হাত দিয়ে দেখাই ওকে: 'এই দেখো—আমরা 'শাস্তি' চাই, 'শাস্তি' চাই হয়ে গেছে, কী কমরেড আপোস করবে?' চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার পর বোকা বনে গেছে সিদ্দিক। 'দেখছো—শালারা করেছে কী! দালাল ট্রেড ইউনিয়নের লোক নাকি কম্পোজিটারটা?' হো হো করে হেসে উঠেছি আমরা সকলেই।

খাঁটি মজুরের বাচ্চা সেখ সিদ্দিক—মজবুত লড়নেওয়ালা কর্মী, মনে দুর্দান্ত জোর, ইস্পাতের মতো ধারালো ওর কাটা কাটা সাফ কথা। আমাদের মধ্যবিত্ত রক্ত যেখানে ঘনঘন হোঁচট খায়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা বদলাতে থাকে, সেখানে দেখেছি অবশ্যম্ভাবীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও। কতোসময় আমাকে ঠাট্টা করেছে ও, 'আপনারা ভদ্দরলোক—এক কদম আগে, তো দু কদম পিছে!' আমার সাহিত্য-করাকে এই দুদিন আগেও 'বাবু শ্রেণীর বিলাস' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। 'নাটক নভেল লিখলে হবে না—আসেন লড়াই করেন—' আমি বুঝিয়েছি: 'লড়াইটা শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রের মধ্যেই আটকে নেই কমরেড। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আজ বেনামী ভাড়াটে দালালেরা ঢুকে পড়েছে, সেখানেও প্রচণ্ড লড়াইয়ের মুখোমুখী হতে হচ্ছে আমাদের—প্রগতিশীল লেখকদের। শ্রেণী-সংগ্রাম শুধু রাজনীতির আওতার মধ্যেই

তো পড়েনা—সংস্কৃতির ফ্রন্টও আজ শ্রেণী সংগ্রামের কায়দায় খাড়াখাড়ি দুভাগ হয়ে গেছে। হাতের তাগদ করবার সংগে সংগে জনসাধারণের চিন্তাধারাকেও প্রস্তুত করে তুলতে হবে কমরেড়।' আমার বক্তৃতাতে এবার ভণ্ড সিদ্ধিক হা হা করে হেসে ওঠে। আমার হাতকে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে চায় ও: 'জানি—আমি জানি কমলভাই—লেখেন আমাদের জন্মে লেখেন—আমরাও সাহিত্য ভালোবাসি—আমাদের মনেও খোরাক দেন, বল দেন—'

কিন্তু···আজ একটা গল্প শুরু করতেই হবে। 'পূর্ব-প্রণাম' থেকে জোর তাগিদ করে পাঠিয়েছে। শ্রদ্ধেয়-সম্পাদক অনুযোগ করে চিঠি লিখেছেন: 'কমলবাবু—একদিন অফিসে 'নীরব-কবি' কথাটা নিয়ে বেদম তর্ক উপস্থিত হয়েছিলো আপনার সংগে, আশাকরি আপনার মনে আছে। আপনি 'নীরব-কবিত্ব' কথাটাকে 'সোনার পাথরবাটি'-রূপ আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: ভাব বা feelings থাকলেই তাকে কবি বলা যায় না। কারণ feelings দেখা যায় কম বেশি সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। কবির সংগে সাধারণ মানুষের তফাৎ এইখানে: কবি শুধু মনোভাবকে observe করেই ক্ষান্ত নন, তাকে expression দেন তিনি! আপনার অচ্ছেদ্য যুক্তিকে আমি মেনেই নি অগত্যা! কিন্তু আজ যদি আপনার ওপর আমি অনুযোগ আনি যে আপনিও সেই নীরব-কবির দলে, তাহলে কী সেটা কিছু অযৌক্তিক হয়! 'লেখক' নাম নেবেন, অথচ লিখবেন না—এ কেমনধারা পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা আপনাদের বলুন তো! আজ কয়েক মাস ধরে আপনার কাছে একটা লেখা চেয়েও পাওয়া যায় না। তাহলে বলুন: আমরা মাসিকপত্র বন্ধ করে দিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে দালালী করি! তাতে টাকাও আছে অথচ 'চাতক বারি যাচে রে'র মতো হা-পিত্যেশ করে থাকবার অতো অবকাশও নেই!'

শ্রাঃ—সম্পাদক মশায়ের অনুযোগকে মেনে নিতেই হবে। অপরাধ স্বীকার না-করে উপায় কী!

ভাবছিঃ কমরেড সিদ্ধিককে নিয়েই গল্প লিখবো। এছাড়া আমার মনে আর আপাতত অন্যকিছু আসছে না।

পদ্ম বহুক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিলো কমলের ঘরের দোরের আড়াল থেকে। গরম দুপুর। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। স্বামী আফিসে, দিদিমা ওধারের বারান্দায় পড়ে পড়ে নাক ডাকছেন। হাঁপিয়ে উঠছিলো পদ্ম। মাগো মা, একা-একা ভাল লাগে! মনে পড়লোঃ ঠাকুরপোর কথা। এই সাতদিনের মধ্যেও ওর সংগে ভালো করে আলাপও হলো না পদ্মর। বাড়িতে লোকটা থাকেও বা কোন সময়··খাওয়ার কথা মনে পড়লে বোধ হয় আসে, যতোক্ষণ বাড়িতে থাকে কারুর সংগে কথা নেই—ঘরে বসে বসে কী করে যে কাটায়!

পদ্মর দাঁড়িয়ে থেকে পা ধরে যায়। সোজা ঢুকতেও কী রকম কুণ্ঠায় জড়িয়ে যাচ্ছে পা। বিছানার উপর হুমড়ি খেয়ে কী লিখছে ঠাকুরপো? অতো মনোযোগে!

লিখতে লিখতে একবার নিশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো কমলের। চুরি করে দেখতে ধরা পড়ায় কী লজ্জা! পদ্ম পালাচ্ছিলো।

কমল উঠে এলো তাড়াতাড়ি। ‘বৌদি—আরে বাঃ আসুন—’

পদ্ম উপায় নেই দেখে ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকলো।

‘বসুন—’ চৌকীর একধার দেখিয়ে দিলো কমল।

পদ্ম বসলো।

ঠাকুরপোর বিছানার পাশে কতোগুলো লেখা কাগজ, পাশেই ক্যাপ-খোলা পেন! এতো কী লেখা—লোকে এতো লিখতেও পারে! হাতের লেখাটা কিন্তু বেশ গোটা গোটা—আর কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইস্কুলে

ফোর্থ ক্লাসে, মনে পড়ছে, হাতের লেখায় ও দ্বিতীয় হয়েছিলো, প্রথম হতে পারতো, কিন্তু নিব্‌ ঝাড়তে কালি পড়ে গিয়েছিলো এক জায়গায়।

কী ভাবে আলাপটা শুরু হবে দুজনেই ভাবছিলো। ঠিক এক্ষেত্রে কী বলতে হয় কমলের অভিজ্ঞতা নেই। আজ সসংকোচে বুঝতে পারলো ও: এক আদর্শবাদে জীবনকে গড়ে তুলতে কীরকম গণ্ডিবদ্ধ, যান্ত্রিক হয়ে গেছে ও। শুধু ও একা নয়—দেখেছো তো আরো অনেককে! কমরেড দত্ত—সহযোগী কর্মী ভিন্ন, সাধারণের সংগে কথাই বলতে পারেন না। সারাক্ষণ 'থিসিস' 'প্লান অব য়্যাকশন,' 'ক্লাশ স্ট্রাগল' ছাড়া আর অন্য কিছু মগজে আসে না ওঁর। খুব বড়ো জোর: 'কেমন?—ভালো তো?' কিম্বা 'আপনি সংসারী মানুষ খুব ব্যস্ত তাই না?' অনর্থক শুকনো জিজ্ঞাসা বোকার মতো...হয়তো ভদ্রলোক যাচ্ছেন বাজারে থলি হাতে—'কোথায় চললেন?' নিজের বেলাতেও কমল দেখেছে একই মুশকিল। বাড়িতে কারুর সংগে কথা বলতে পারে না ও, রাস্তায় চেনা লোকের সংগে দেখা হলে বড়ো জোর একটা 'চিনি-চিনি' হাসি। কোন্ এক পুরানো বন্ধু বলছিলো সেদিন: 'তোরা নিজেদের এতো বেশি gravity দিয়ে ঘিরে রাখিস কাছে ভিড়তে ভয় পাই। জনগণকে ভালোবাসিস অথচ এতো অহংকার!'...সত্যি বাইরে থেকে সকলেই তাই মনে করে। অথচ কমরেড সিদ্দিক, দত্ত এদের সংগে কথা বলতে তো মুখ খুলে যায়!

ভাবতে ভাবতে ভুলে যায় কমল বৌদিকে বসিয়ে রেখেছে সামনে।

'বাড়ির জন্যে মন খারাপ করেনা আপনার?' বেঁফাশ একটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে মারলো কমল। বলার পরেই কথাটার অর্থশূন্যতা বুঝতে পারলো নিজের প্রশ্নটা নিজের কানেই বেমানান ঠেকলো। অথচ সব লোকই তো এরকম প্রশ্ন করে—উপস্থিত ক্ষেত্রে যে কোন লোকই ঠিক

এই রকমভাবে কথা আরম্ভ করবে এটা সে হলফ করে বলতে পারে। আলাপ করবার বিশেষ রীতিই বোধহয় এইরকম। দেশি বিদেশি সব সমাজেই তো তাই। 'গুড মর্নিং—' দিয়ে য়ুরোপীয় শিষ্টাচার, ভদ্রতার শুরু, আমাদের যেমন 'কেমন আছেন?'

পদ্ম হাসলো। ঠাকুরপোর ভেতরটা যেন এক লহমায় পড়ে ফেলতে পারলো ও। ওই সংকোচের বরফ ভাঙতে প্রথম ভূমিকা নিলো।

'কী লিখছেন এসব?'

'গল্প।'

'গল্প!' পদ্মর চোখে যেন বিস্ময়ের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়লো। গল্প লেখকদের সম্বন্ধে এর আগে কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিল না ওর। গল্প লিখিয়েদের সে অদ্ভুত কিছু মনে করতো—হয়ত তারা কী রকম কীরকম! ......ওর এই সাধারণ ঠাকুরপো, একেবারে সাধারণ—কখনো গল্প লিখতে পারে—বিশ্বাস করতেও পারছে না ও।

'আপনি গল্প লেখেন!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না পদ্ম। ভুল শুনেছে হয়তো। হয়তো ঠাকুরপো বলছিলেন 'গল্প-পড়ার' কথা 'লেখার' কথা নয়! কিন্তু লেখা-কাগজগুলো তো মিথ্যে নয়—তাহলে হয়তো বই থেকে টুকে নিচ্ছেন...

কমল হেসে বললে, 'কেন গল্প লেখা এমন কি কঠিন কাজ! পড়বেন আপনি গল্প—'

'আ—মি?' পদ্ম ঢোঁক গেলে।

'কেন, আপনি গল্পের বই পড়েন না?'

পদ্ম বোকার মতো মাথা নাড়লো। 'না বাড়িতে গুরুজনেরা বাজে বই পড়তে দিতেন না। নাটক নভেল পড়লে মেয়ে খারাপ হয়ে যায়।'

কমল একমুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে গেলো। বৌদির কথাগুলো পরিহাস কিনা বুঝে উঠতে পারছিলো না!

কিন্তু পদ্মর কথাগুলো পরিহাস নয়, পরেই বোঝা গেলো। 'তবে মা কাকীরা পড়তেন—ওদের পড়তে তো কোনো দোষ নেই, আমাদের কুমারী মেয়েদেরই কেবল পড়তে মানা।' পদ্ম যোগ করলো।

কমল বিশ্বাস করলো। 'তবু···কোনো বইই পড়েন নি?'

'হ্যাঁ পড়েছি তো। দু'একখানা বই·· শরৎচন্দ্রের 'নৌকাডুবি' আর···'

কমল হাসবে না মনে করেও চেপে রাখতে পারলো না। অন্তরে সে ব্যথা পাচ্ছিলো সত্যিই। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' প্রাণীটির ট্রাজেডি কী এই মেয়েটির চেয়েও বেশি হৃদয়স্পর্শী! পুতুলগুলো কবে প্রাণ ফিরে পাবে? এই মুহূর্তে অধৈর্য হয়ে উঠছে ও।

'বৌদি—তোমাকে আমি বই দেবো—পড়বে তো?'

হঠাৎ এই 'তুমি' সম্বোধনে কেউ বিচলিত হলো না। কথার অন্তর্লোকে আরো একটা জগৎ রয়েছে সেখানে ওরা খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

পদ্ম হেসে বললে, 'কই দাও দেখি—কী বই দেবে?'

'এতো তাড়াতাড়ি!' কমল উঠে তাক থেকে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বইখানা এনে দিলো। 'ঘুমোবার জন্যে পড়লে চলবে না, পড়ে ঘুমোতে হবে, বুঝলে?'

'আচ্ছা গো আচ্ছা?' পদ্ম বুক খালি করে হেসে উঠলো।

'কটা বেজেছে বলোতো? চারটের সময়ে একবার বেরোতে হবে—'

পদ্ম ঘড়ি দেখে বললে, 'সাড়ে তিনটে। কিন্তু বারে তোমার গল্প পড়ে শোনাবে না?'

কমল ছদ্মগাম্ভীর্যের সংগে বললে, 'নিজের গল্প পড়ে শোনাতে নেই—অহংকার হয়—বরং এই কাগজটায় আমার গল্প রয়েছে নিজে পড়বে। শুধু পড়লেই চলবে না—পড়ে বলতে হবে কী রকম লাগলো। জানোতো দইওলা দই দিয়ে জিগ্যেস করে টক না মিষ্টি···'

পদ্ম হেসে বললে, 'মিছে কথা। বইওলার নিজের বই সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা। বাবাঃ, টক বলবার কী যো আছে, তাহলে মারমুখো হয়ে উঠবে না ?'

কমল উত্তর করলো : 'আমি কিন্তু অন্য ধরনের বইওলা। আমার বই একবার টকে' গেছে জানলে পরের বারে ভালো করবার চেষ্টা করি। অতএব মাভৈঃ।'

দুজনেই হেসে উঠলো নির্দোষ আমোদে।

কমল উঠলো। জামাটা গায়ে গলিয়ে জুতো পায়ে বেরিয়ে পড়লো।

রাজপথ।

শ্যামলী···

আজ প্রায় একমাস। শ্যামলীর সংগে দেখা নেই, শ্যামলী প্রথমে অভিমান করেছিলো, পুরোপুরি অসহযোগিতা করবার সংকল্প, কিন্তু অভিমানকে বেশিদিন টেনে বেড়াতে পারেনি ও, ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন খোঁজ করেছিলো আমার বাড়িতে। 'নেই—একটু আগে বেরিয়ে গেছে,' কিম্বা, 'কই এখনো ফেরেনি তো!' এরকম উত্তর শুনে শুনে শ্যামলী রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। জানি : ওকে প্রথমে বোঝানো যাবে না কিছুতেই। 'কাজ? ওঃ—' ঠোঁট ফুলিয়ে ও উত্তর দেবে : 'তোমার কাজে আমি কোনোদিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি! মিথ্যেবাদী—আমাকে বিশ্বাস করতে বলো : এই দীর্ঘ একটা মাস তুমি আমার সংগে দেখা করবার ফুরসৎ করে উঠতে পারোনি!'···নাঃ সহজে কিছুতেই আপোস করবে না ও—একেবারে চরমপন্থী! তখন বাধ্য হয়ে সেন্টিমেণ্টাল এপিল করবে কমল : 'আমাদের এতোগুলো মেশামেশার জীবনে একটা ক্ষুদ্র মাসই বড়ো অংশ হয়ে দাঁড়াবে শ্যামলী—? যে ভালবাসা কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে কেবল ওয়েটিং রুমের বিলাস খুঁজবে—তার মৃত্যু হওয়াই ভালো!···' ব্যস!

আর দেখতে হবে না। শ্যামলীর ভালোবাসাকে কেউ কটাক্ষপাত করলে আর সহ্য হবে না। মুখ ভার করে বলবে, 'বেশ—বেশ—আমার কথার বুঝি এই অর্থ হলো! আমি কেবল তোমাকে পেছনে টানতে চাই। বেশ বেশ—আমি প্রতিক্রিয়াশীল, আমি—আমি—'

শ্যামলী মজুমদার—কলেজের উৎসাহী ছাত্র-কর্মী। চালিয়াৎ মেয়েদের ভাষায়: 'ডি ফ্যাক্টো লিডার!' প্রিন্সিপালের ব্ল্যাক-বুকে: 'গণ্ডগোল আর হুজুগের পাণ্ডা!' স্ট্রাইক, ডেমোনেস্ট্রেশন, আর ময়দানের মিটিঙের ভ্যানগার্ড! শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায়, ছাত্রদের মিছিলে, কোথায় গুলি চলেছে—ব্যস, প্রিন্সিপাল আর দরোয়ান দিয়ে লোহার গেট বন্ধ করে রাখতে পারলেন না। হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়েছে থার্ড ইয়ারের শ্যামলী মজুমদার। আর সংগে সংগে, দু একজন 'বোনাফাইড' ছাড়া, সমস্ত কলেজ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে পড়েছে। 'দমননীতি চলবে না—' 'পুলিস জুলুম বন্ধ করো—' 'হত্যাকারীর শাস্তি চাই—' শ্যামলী মজুমদারকে চেনে না কে! চোখা মুখ, এলোমেলো চুল, শক্ত করে আঁটা কাপড়, বজ্রমুষ্টি তুলে এগিয়ে চলেছে—ওকে চিনতে দেরী হয় না। ব্ল্যাক এ্যাক্টের প্রতিবাদে, ভিয়েৎনাম দিবসে—পুলিসের বেটনের গুঁতো আর টিয়ার গ্যাস বেমালুম সহ্য করে শক্ত হয়ে বসে পড়েছে শ্যামলী রাজপথের ওপরেই। মাথা ফেটেছে বেটনের ঘায়ে, গ্যাসে চোখ জ্বালা করে উঠেছে—কিন্তু no quarter to thy enemy! পুলিস ভ্যানে বন্দী করে নিয়ে গেছে হাজতে। আবার ফিরে এসে নেতৃত্ব নিয়ে কায়েম হয়ে বসেছে ও!…

সেই বিখ্যাত শ্যামলী মজুমদার—সেও সেন্টিমেন্টে কাবু হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। Mixture of opposites!… 'দুর্বলতা!' ব্যস আর রক্ষে নেই! নাক উঁচু করে সগর্বে স্বীকার করবে শ্যামলী: 'বেশ, এর নাম যদি দুর্বলতা হয় তাহলে আমি মেনে নিচ্ছি! এই পচা সমাজের মতো ভালবাসাকেও তোমরা বে-আইনী করেছো তা তো জানতাম না।

দা - ১২০৩৪

আমরা স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ধারা গড়ে তুলতে চাই, তাতে তথাকথিত মঠ আর সৎসংগের 'বাবাদের' মতো সেক্সচুয়াল পারভারশনকে স্বর্গীয় মহাপুরুষত্ব বলে প্রচার করবার অবকাশ নেই। Man is man for ever—আমরা মানুষ থাকতে চাই!' 'এবং মেয়ে মানুষ—' আমি যোগ করি। ও-ও সদর্পে প্রতিষ্ঠিত করে: 'এবং মেয়েমানুষ।'

না—শ্যামলীকে আর খেপিয়ে লাভ নেই। এবার সন্ধি করতে হবে—বিনা শর্তে।

শ্যামলীর ঘরে পা দিতেই একটু থতমত খেয়ে গেল কমল।

কোমরে কাপড় এঁটে হাঁটু গেড়ে বসেছে শ্যামলী। মেঝের উপর পুরানো খবরের কাগজের স্তূপ। আলতার শিশি—তুলি নিয়ে পোস্টার লিখছে শ্যামলী মজুমদার।

···ছাত্রদের মাইনে বাড়ানো চলবে না।

···বছব বছর পাঠ্যপুস্তক বদলানো চলবে না।

...কণ্ট্রোলে কাগজ চাই, কেরাসিন চাই···

কমল হতাশভংগী করে ভেঙে পড়লো চৌকীর ওপর। এ কী তার নায়িকা-ভাগ্য! অভিসার মুহূর্তটাই মাঠে মারা গেলো!

'এ হে! এমন সিচুয়েশানটাই একেবারে নষ্ট করে দিলে দেখছি!' কমল অভিনয় করে বলে উঠলো।

মুখ টিপে একবার ওর দিকে চেয়ে আবার কাজে ডুবে গেলো শ্যামলী। বললে, 'কেন, কী হলো—?'

কমল গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললে, 'আর কি হলো! মুড-ই নষ্ট হয়ে গেলো। প্রেম করতে এসেছিলাম—'

'যাও—ফাজলামি করো না—' শ্যামলী ধমক দিয়ে উঠলো। 'এসো তো—কয়েকটা পোস্টার লিখে দাও—'

'আমি মুটে নই। পারবো না—' কমল চৌকীর ওপর গা মেলে দিলো। কিন্তু···বেশিক্ষণ পারলো না। শ্যামলী আজ ভয়নক সিরিয়াস··· mixture of opposite···? 'কই, দাও—কী লিখতে হবে—দেনা শোধ করি—'

'লেখো—পুলিস বাজেটে টাকা কমাও—শিক্ষা বাজেটে টাকা বাড়াও—'

কমল লিখতে আরম্ভ করলো।

'জানলে : কাল সমস্ত ইস্কুল-কলেজে জেনারেল স্ট্রাইকের কল্ দেয়া হয়েছে। ডেমোনস্ট্রেশন বেরোবে ছুটোর সময়, সেখান থেকে ময়দান। মাইনে কমানোর দাবীর ওপর সমস্ত ছাত্র সমাজের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সোস্যালিস্ট দালালেরা পর্যন্ত স্ট্রাইক সাপোর্ট করেছে! আঘাতটা এবার সরাসরি পড়েছে কিনা, তাই দালালীর নেশা ছুটেছে—' বকবক করে বকে গেলো শ্যামলী! 'শিবানীকে চেনো তুমি···বালুচরের শিবানী সেন? ওর বাবা মা'র সংগে আলাপ হলো। বড়ো মুশকিলে পড়েছে শিবানী··· নিম্নমধ্যবিত্ত—ওর বাবা ময়দার কলের কেরানী···বড়ো কষ্ট হয় সত্যি! কেঁদে ফেলেছে সেদিন কমনরুমে : 'আমার আর লেখাপড়া হবে না শ্যামলীদি। আমাদের বাড়ির অবস্থা তো জানোই—বাবাকে দেখে সত্যিই ভেঙে যাই! এমনি ইস্কুলের মাইনে দিতে টানাটানি পড়ে, এরপর মাইনে বাড়লে তো ··' শ্যামলীর কথার উচ্ছাসের তোড় আর থামে না।

কমল বললে, 'থামো। অতো বকো না—লেখায় গোলমাল হয়ে যাবে—'

'ও!'···ঠোঁট বেঁকিয়ে উঠলো শ্যামলী : 'আমি বকছি? থাক আর লিখতে হবে না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি—'

'দিলাম—' কমল এসে আবার বিছানায় বসলো।

পোস্টারগুলো গুটিয়ে উঠিয়ে রাখলো শ্যামলী। তারপর কমলের কাছে এসে বসলো। ওর হাতটা আলতায় লাল হয়ে গেছে, জামা কাপড়ে ছিটে পড়েছে লাল রংএর, গালের এক জায়গায় অনবধানে চুলকোতে গিয়ে আলতার ছোপ পড়েছে।

'চা খাবে ?' নাকের ওপর থেকে দীর্ঘ চুলগুলো সরাতে সরাতে প্রশ্ন করলো শ্যামলী।

'আপত্তি নেই—'

'একটু বোসো তাহলে, আসছি—' শ্যামলী উঠে ভেতরে চলে গেলো।

'শ্যামলী—' বাইরে রাস্তা থেকে মেয়ে কণ্ঠের ডাক ভেসে এলো।

কমল উঠলো। দরজার বাইরে একটি মেয়ে।

'কাকে চাই ?'

'শ্যামলী বাসায় নেই ?' মেয়েটি জিগ্যেস করলো।

'আসুন—ভেতরে আসুন—'

'আরে! পাপড়ি তুই!' চা হাতে করে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই উচ্ছল হয়ে উঠলো শ্যামলী। 'পথ ভুল করে নাকি। যাক ভালোই হলো। দাঁড়া বোস, তোর চা নিয়ে আসি—'

শ্যামলী এক কাপ চা এনে পাপড়িকে দিলো।

'যাক ভালোই হয়েছে। কমল—তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দি'। পাপড়ি দে—আমার ক্লাশ-মেট। তোমার লেখার একজন রীতিমত ভক্ত এবং কঠোর সমালোচক। আর পাপড়ি—এই নে তোর 'কালাপাহাড়' লেখক—শ্রীযুক্ত কমল লাহিড়ী...'

'নমস্কার—' পাপড়ি আলগোছে হাত তুলে (যে পোজে ওকে হাত তুললে ভালো দেখায়—বিশেষ ভাবে আয়নায় মহড়া দেয়া সেই পোজ!)

নমস্কার জানালো। এই সেই কমল লাহিড়ী—ওর 'ফেবারিট স্টোরি-টেলার'! ওঁর চোখা শক্ত গল্পগুলোর মতোই তীক্ষ্ণ আর দৃপ্ত। ঋজু, ছিপছিপে, এক মাথা ঘন চুল, সরু সরু আঙুলগুলো আগুনের শিখার মতো যেন কথা কইতে পারে। সুন্দর!

শ্যামলী হেসে উঠলো, 'কী তুই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলি! তোর অভিযোগগুলো কড়া ভাষায় পেশ কর—'

পাপড়ি হাসলো। 'সত্যি—আপনার সংগে এভাবে আলাপ হয়ে যাবে · '

কমল বললে, 'কেমন? আলাপ করে ঠকলেন তো!'

পাপড়ি বললে, 'হ্যাঁ, ঠকেছি কিন্তু সত্যিই। আপনার গল্পে জনগণের কথা লেখেন বলে ভাবতেই পারিনি যে আপনিও ঠিক সেই জনগণের মুখপাত্র!'

'জনগণের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আপনার এমন ভুল ধারণা কেন!'

'ধারণা হয়েছে বাস্তব থেকে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ-সাহিত্যিক শ্রীহীন রমাকিংকরকে দেখে আমার এ ধারণা। সিল্কের পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, সোনার চশমা, চাইনিস পাম্প, মুখে সিগার—সম্প্রতি কেনা বেবি অস্টিন ছাড়া সভাসমিতিতে নড়েন না তিনি! আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। অথচ ওঁর লেখায় সাধারণ চাষী মজুর, নিরক্ষর সাঁওতাল আর গাঁয়ের কবিগানের গায়কদের প্রতি গভীর দরদ আর বেদনা ফুটে উঠেছে।··· আমার কথায় আপত্তি করবেন আপনি?'

'না। আপত্তি করবার কিছুই নেই। লেখকরা যে বেশিরভাগই কেরিয়ারিস্ট আর আত্মসর্বস্ব এ-সত্যকে আপত্তি জানাবো কোন্ ভাষায়! কিন্তু···যুগ পাল্‌টাচ্ছে—জাগ্রত জনগণের সংগে সংগে সত্যিকারের গণ-সাহিত্য গড়ে উঠছে···জনগণকে blackmail করা যাবে না আর তা ওই সব তথাকথিত মুখোশ-পরা গণ-সাহিত্যিকের দল বুঝতে পারছেন।

আজকের দিনে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে যে সব লেখক বেরিয়ে আসছেন—তাঁদের কাছে সাহিত্য পয়সা করার যন্তর নয়, কড়া হাতিয়ার। শ্রমিক-চাষীরা যেমন কাস্তে আর হাতুড়ি নিয়ে লড়াই করেন, তেমনি লেখকরাও করছেন কলম নিয়ে।··· যাক—বড়ো বেশি বক্তৃতা দিচ্ছি···থামলাম।'

পাপড়ি বেশিক্ষণ এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। যুগের হাওয়ায় 'গণসাহিত্য' 'প্রগতি লেখক' 'মার্কসবাদী লেখক'···এসব কতোগুলো নতুন কথা চল্‌তি হয়ে পড়েছে। যাতে পিছিয়ে না পড়তে হয় তাই 'কারেন্ট টপিক্‌স'গুলো খানিকটা মুখস্থ করে রাখতে হয়।

তবু···অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে ওর। লেখকদের উপর মেয়েদের দুর্বলতা চিরকালীন। তাছাড়াও লেখকদের সাথে আলাপ করবার একটা মস্ত বড়ো 'হবি' আছে ওর।

'কিন্তু···' পুরানো কথার জের টেনে চলে পাপড়ি: 'তবু আপনার লেখা আমার ভালো লাগে। আচ্ছা—বড়োলোকদের ওপর আপনার ভয়ানক ঘৃণা, তাই না?'

'কই—ঘৃণার কথা তো আমি কোনোদিন বলিনি!'

'তবে—বড়োলোকদেরকে আপনায় লেখায় অমন ভাবে পেণ্ট্‌ করেন কেন!'

'এটা তো ঘৃণার কথা নয়। ইতিহাসই তাই বলে। বড়োলোকদের পেছনের ইতিহাসই তাই···'

'অর্থাৎ'—পাপড়ির কণ্ঠের ক্রোধ কিছুতেই চাপা পড়ে না: 'বড়োলোকরা চোর, জালিয়াত, দালাল···?'

'আমার বলাবলিতে কিছু যায় আসে না পাপড়ি দেবী। ইতিহাসের শিক্ষাই এই!'

'আপনার কাছে নতুন করে ইতিহাস শিখতে হবে দেখছি!' শ্লেষকণ্ঠে বলে উঠলো পাপড়ি।

'না-জানলে শিখতে দোষ কী!' শান্ত গলায় বললে কমল।

'না দরকার নেই আমার শেখার। আপনি কী বলতে চান: বড়ো লোকদের মধ্যে ভালো কেউ নেই?'

'ব্যক্তিবিশেষের মাপকাঠিতে একটা জাতকে বিচার করা যায় না। ধনীদের শ্রেণীগত চরিত্রই ওই!' একটু থেমে আবার বললে কমল: 'আমি সমাজ ব্যবস্থায় আজ যা আছে তাই দেখাতে চেয়েছি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে, বিত্তবান আর নির্বিত্তদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে। এই-ই শ্রেণী-সংগ্রাম—আপনি শিখুন বা না শিখুন, মানুন বা না মানুন এই সংঘাত অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী!'

'ধনী গরীবে কী মিল হতে পারে না—? গান্ধীজী...'

'পারে না। মহামানবের শুভবুদ্ধির ওপর সামাজিক অবস্থা নির্ভর করে না। বাঘ আর ছাগলে এক ঘাটে জল খাওয়ার বৃত্তান্ত ইতিহাস নয়, আষাঢ়ে গল্প!'

পাপড়ি কিছুক্ষণ চুপ করেছিলো। সহসা দক্ষিণপন্থী 'রবিবারের পত্র' থেকে সদ্য-পড়া একটা লাইন মনে পড়ে গেলো। অভিযোগ করলো 'আপনারা সাহিত্যের কোনো স্বাধীনতা মানতে চান না—'

'Pure Art and impure Art...' 'Abstract liberty...' 'সৃষ্টির স্বাধীনতা...' 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' ...? কমলের মুখে বিদ্রূপের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। Pedantic nonsense! মূর্খ! 'It is impossible to live in society and be independent of society!' বললে, 'ও কথা আপনার নয় জানি। 'সাহিত্যের স্বাধীনতা!' কথার ধোঁয়া সৃষ্টি করে আজ কায়েমী স্বার্থের ভাড়াটে লেখকেরা শাসক শ্রেণীর নিরাপদ আড়াল থেকে status quo-র জয়গান করছে!...আজ গোটা পৃথিবী দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে—চোখ বুঁজে একে অস্বীকার করলেও উপায় নেই! 'Two worlds—two literatures. A world of living,

fighting people and a world in its death agonies, a world of decay, confusion, of bitter hatred for all that is vital, healthy and full-blooded !'...কমলের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে উঠে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক জীবন দর্শনের গভীরতায়। 'হ্যাঁ হ্যাঁ—আমরা জানাতে চাই আমাদের আজকের সাহিত্য শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়! নিশ্চয়ই, আমরা সজোরে ঘোষণা করতে লজ্জা পাই না: আমাদের সাহিত্য শ্রেণীবিশেষের সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য প্রচার করে।—'Man defend thyself! Man conquer thy enemy!' এবং আমাদের এ যুগের সাহিত্যের লক্ষ্যই হবে 'Proletarian H umanism'—The task of which does not demand lyrical declarations of love, it demands from each worker a conciousness of his historic mission of his right to power...না আর নয়।'

পাপড়ি একেবারে মূক হয়ে গেছে। আর তর্ক করবার মতো পুঁজি নেই কোনো।

সন্ধ্যে অনেকক্ষণ নেমেছে।

পাপড়ি নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালো: 'আচ্ছা—আজ আসি—'

বেরিয়ে গেলো ও।

শ্যামলী এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাচলো। 'বাবাঃ, তর্কশাস্ত্রবিশারদ—তোমার চীৎকারের ঠেলায় রাস্তায় লোক জমে যেতো একটু হলে!'

কমল হাসলো। 'তা অমুক—লাভ বই লোকশান নেই!'

'কিন্তু—তোমার বক্তৃতা নেহাৎ অরণ্যে রোদন হলো—'

'তাতো হলোই। যেমন করে হলো আজ প্রেম জানাতে এসে!'

'দুষ্টু!' ঝিকিয়ে উঠলো শ্যামলীর দাঁতগুলো। 'আমার বন্ধুটির পরিচয় পেলে তো? মস্ত ধনী—এটর্নীর দুলালী মেয়ে, রোজ মোটরে করে ওর বাবা ওকে কলেজে পৌছে দিয়ে যায়। আর যে কথা

তোমাকে আগে বলা হয়নি 'কন্টিনেন্টাল লিটারেচারের ভীষণ অনুরাগী। হ্যাভলক এলিস, এলিয়ট আর লরেন্সের ভক্ত। 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' ও ডজনখানেকবার পড়েছে।...' ...শ্যামলী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

কমল বললে, 'ঠিক এই রকমই হওয়া উচিত'—

'তাছাড়া'—শ্যামলী খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'অষ্টম হেনরীর মতোই ওর 'লভ-ফিলসফি'—প্রেমের মৃত্যু নেই। 'একটি প্রেমিক চলিয়া গেলে আর একটি আসে।' প্রেম ওর কাছে একগ্লাস জল খাওয়ার মতো। কী যে বলছিলে তুমি সেদিন লেনিনের ভাষায়: 'drinking from a mud puddle'···ঠিক তাই—'

কমল উঠে দাঁড়ালো।

'চললে? বাঃ—'শ্যামলীর কণ্ঠে অনুযোগ।

'হ্যাঁ'—হঠাৎ মনে পড়লো কমলের। চিরঞ্জীবের অনেকদিন খোঁজ নেওয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদী কাগজের রিপোর্টার চিরঞ্জীব ধর। বন্ধু চিরঞ্জীব—কবি চিরঞ্জীব। বড্ড বেশি সেন্টিমেন্টাল আর রোমান্টিক ছেলেটা। যা বিশ্বাস করে যুক্তি দিয়ে করে না, করে হৃদয় দিয়ে। রোগা-রোগা, ফ্যাকাশে চেহারা। অদ্ভুত জ্বালাময় ওর চোখের দৃষ্টি। ওর বুকে আগুন আছে—দপ করে জ্বলে উঠে ও যে কোনো উত্তেজক পরিস্থিতি পেলে। কিন্তু অস্থির আর বড়ো চঞ্চল। কোনো নিয়মশৃংখলার বাঁধনের মধ্যে ধীর স্থির হয়ে কার্যক্রম নেবার ধৈর্য নেই ওর। ওর মত: 'now or never!' 'একটা কিছু হয়ে যাক এই মুহূর্তে—আর ভাল লাগে না ভাই।' ওকে বোঝাই: 'একটা বিরাট আকারের আগুন জ্বালাতে বিরাট কাঠ খড়ের প্রয়োজন, কবি। অধৈর্যতা—মধ্যবিত্তসুলভ খোকামি!' ···ওর দোষগুনের মধ্যে থেকেও তবু ওকে ভালো লাগে, ও আমার বন্ধু, পাগলাটে আর জ্বালাময়!·· কিন্তু এতো অসুখে ভোগে কেন ও?

শ্যামলী দোর পর্যন্ত এলো। 'কাল আসছো তো—?'

কমল পেছন ফিরে একবার হাসলো। তারপর বেরিয়ে গেলো রাস্তার অন্ধকারে।

সেদিন অনেক দেরী করে ফিরে এলো বলাই অফিস থেকে।

পদ্ম ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। দশটা থেকে পাঁচটার দীর্ঘ সময়। অফিস! খুবই কী কষ্টকর অফিসের সময়গুলো? লোকটাকে দেখে ওর রোজই অদ্ভুত লাগে। সকলে উঠে চা খেয়েই দাড়ি কামাতে বসে কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটে। রোজ নিয়মিত। সময় যায়। সাবান দিয়ে চান করতে আধ ঘন্টা, চুল ব্রাস করতে আর সাজ পোশাক করতে করতে নটা, খেতে পাঁচ মিনিট। তারপর পান চিবোতে চিবোতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে যায় ত্বরিত পায়ে। ফিরতে ছটা—কোনো কোনোদিন সন্ধ্যে। সকালে বেরোবার সময়ের প্রফুল্লতা থাকে না ফেরবার মুখে, নির্জীব, এলিয়ে পড়া অবসাদে ছোট হয়ে আসে ওর মুখ। কথা বলে না। মুখখানা কী রকম গুম্ মেরে থাকে। অফিসে কী ভয়ানক খাটনি!

কিন্তু আজ ফিরতে ওর বড়ো দেরী! আটটা বেজে গেছে ঘড়িতে।

ঘরে ঢুকে জামা ছাড়তে লাগলো বলাই।

পদ্ম জিগ্যেস না করে পারলো না। 'তোমার আজ এতো দেরী··· ?'

'হুঁ···' বলাই জামা ছেড়ে বিছানার ওপর গা ছেড়ে দিলো।

পদ্ম বুঝলো মানুষটাকে এখন প্রশ্ন করাই বৃথা! বললে, 'জল এনে দি--মুখ হাত ধোও—'

'না—'

'চা খাবে?'

'না—' বড়ো নিস্পৃহ জবাব বলাইয়ের।

'অফিসে কিছু হয়েছে নাকি? ওগো—?'

'কেন বকাচ্ছো মিছিমিছি—'বলাই ধমক দিয়ে উঠলো বিশ্রীভাবে।

পদ্ম গুটিয়ে গেলো এতোটুকু হয়ে। ক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। আঘাত পেয়েছে।

বলাই বুঝতে পারলো রাগ করে বেরিয়ে গেলো পদ্ম। রাগ! বিতৃষ্ণায় মুখের ভেতরটা কেমন তেতো হয়ে ওঠে ওর। দশটা থেকে পাঁচটার একঘেয়ে বিরক্তিকর অবসাদ। নোটশিট লেখা আর ফাইলের জমে ওঠা স্তূপ। ঢালা হুকুম বড়ো বাবুর 'আর্জেণ্ট' 'টুডে' 'আর্লি প্লিজ'! পাহাড় প্রমাণ হয়ে ওঠে কাজের জঞ্জাল।...ব্যাঙের মত থপথপে একটা জড়পিণ্ডের স্তূপ··· ঘুষ আর ভেটের প্রসাদে চর্বি ঠেলে উঠেছে। কুতকুতে চোখে অমায়িক হাসি। পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে কেরানীদের মারফত সব কাজ বাগিয়ে নেয়া! 'হ্যা হ্যা হ্যা—খাটুন খাটুন খুব করে। এইতো খাটবার বয়েস ···তবেই তো কাজের উন্নতি হবে। আপনাদের বয়েসে আমরা···' তারপর গা বুলিয়ে দেবার ঢঙে : 'হ্যাঁ কাজ করেন আমাদের বলাইবাবু। ইয়ং এণ্ড্ স্মার্ট। এইতো চাই। ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট—যতো কাজ করবেন ততো জাতির উন্নতি, দেশের উন্নতি···।' সত্যি : গাধার মতো মুখ বুজে কাজ করে যায় ও। চাকরী করতে এসে বড়োবাবু আর বড়ো সাহেবদের সমীহ করে চলা যে চাকরী স্থায়িত্বের একমাত্র স্তম্ভ এ কথা জানে ও। এবং মানেও তাই। ···কিন্তু তার বদলে পুরস্কার কী মেলে? বড়োবাবুর মন তো গলে না; খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠলেও বড়োবাবু 'not satisfied!' 'এ হে বলাইবাবুকে ভেবেছিলাম বেশ কাজের মানুষ। ওবিডিয়েণ্ট এণ্ড্ লয়্যাল। কিন্তু বড্ড স্লো। অতো ঢিমে তেতালায় কী কাজ হয়। হ্যাঁ কাজ করতাম আমরা। তখন আমার ওপরওলা গোমেস সাহেব···

এই তখন আমি একেবারে নভিস, কিন্তু সিনসিয়ার এণ্ড আর্নেস্ট। বুঝলেন রোজই 'হিভস' অব কাজ আমার টেবিলে, রোজই কাজ সেরে একেবারে রাত্রে বাড়ি ফিরতাম, যেগুলো হতোনা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বুঝতাম। সাহেব তো ভয়ানক খুশি। একদিন কামরায় নিয়ে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলে 'Satisfied very much with your works Balai··· তোমার ফিউচার প্রসপেক্টের প্রচুর আশা রাখি।' আমি উত্তর করলাম সে তোমায় দয়া সাহেব। I am your most obedient servant.···'বড়োবাবু মুখে একসংগে দুটো পান পুরে আবার বলতে শুরু করতেন: 'কিন্তু আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কেমন দুর্বিনীত, কাজকর্ম জানবে না, শিখবে না এতোটুকু, ফাঁকি দেবে সুযোগ পেলেই। বুঝেছেন সব 'কোরাপ্টেড' হয়ে গেছে। আর সুপরিয়ারসদের ওপর বিন্দুমাত্র 'রেসপেক্ট' নেই। কাজ করতে এসেছে তো না যেন হাওয়া খেতে এসেছে। কাজ হলো বা না হলো। আবার হুজুগের বেলায় আছে পুরো—মাইনে বাড়াও, ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স চাই, রেশন চাই··· আমরা মশাই তিরিশ টাকায় কাজে ঢুকেছি, এতো হুজুগ আর স্ট্রাইকের ধার ধারতাম না। হ্যাঁ: জানতাম কাজ করছি মন দিয়ে উন্নতি হবেই। উদ্যোগী পুরুষণাং লক্ষ্মী—শাস্ত্রেই আছে··'

বিড় বিড় করে ওঠে বলাই: পদ্ম রাগ করেছে। কী জানে ও আফিসের! মেয়েরা মেয়েদের মতো থাকনা বাপু! কী বুঝবে ওরা কী হাড় ভেঙে মাথা গুঁজে কাজ করতে হয় পুরুষদের! সংসার চালানোটা অতো সস্তা নয়। কথাটা মনে উচ্চাচরণ করতে করতে একটা গভীর আত্মম্ভরিতা আর আত্মতৃপ্তি আসে মনে।

কে চালাচ্ছে এই সংসার? অথর্ব অক্ষম বাপ, বুড়ি দিদিমা, 'বিধবা' গুণধর ভাই! কার রোজগারে আজ চলছে বাড়ির লোকদের দুবেলা খাওয়া!

গর্বে ফুলে উঠে বলাইয়ের বুকখানা।

নির্জন রাত্রির গভীরতায় কিন্তু পদ্ম প্রতিশোধ নিতে ভুল করে না। কাঠ হয়ে পেছন ফিরে শক্ত হয়ে থাকে। বুঝুক মানুষটা—যারা পড়ে পড়ে মার খায় তারাও বিদ্রোহ করতে পারে। শীঘ্র সন্ধি করবে না ও। বুঝুক বুঝুক লোকটা দিনের বেলায় যাদের ঠেলে ফেলা যায়, রাত্তিরে তাদেরকেই আবার টেনে নিতে হয়। অনুতাপ করুক, ভিজে গলায় স্বীকার করুক; উত্তপ্ত মাথায় যা বলেছি তা ভুলে যাও, আর হবে না এমন ব্যবহার কোনোদিন। তারপর···

'কই? কী হলো'—বলাই আকর্ষণ করছে ওকে।

দাঁতে দাঁত এঁটে একভাবে পড়ে থাকে পদ্ম। মান ভাঙুক এখন!

'কই—শুনছো?' বলাইয়ের কণ্ঠ মোটেই ভিজে ভিজে শোনালো না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠেছে ও: মেয়েমাগিদের ন্যাকামো দেখে আর বাঁচিনে। একটি পয়সা রোজগারের মুরদ নেই—ঢঙের বেলায় আছে রাজরাজেশ্বরী।···রাত জাগতে মোটেই রাজী নয় বলাই। সামান্য রাতের এই কটা ঘণ্টা যদি যথানিয়মে ঘুমোতে না পারা যায় তাহলে আর শান্তি কোথায়!

পদ্মর কী বুঝতে ভুল হয়েছে স্বামীকে? এক মুহূর্তে পাশের লোকটির অস্তিত্ব পীড়া দিয়ে ওঠে ওর মনকে। ঘিন ঘিন চ্যাটচেটে করে উঠে সারা গা—মদনদার বাড়ি থেকে ফিরে রাত্তিরে শোবার সময় যেমন হয়েছিলো একদিন।···বিবাহ! বিয়ের চেয়ে নাকি স্ত্রীর বড়ো কিছু নেই। 'পতি-দেবতা'···'স্বামীর ঘরে রাজরানীর মতো প্রতিষ্ঠিত হও'···'স্বামী সোহাগী হও'—বাপের বাড়ি থেকে বিদায়ের দিনে গুরুজনদের কতো উপদেশ!··· এই কী বিবাহ? 'নতুন বউ' আজও যে তাকে সকলে বলে! এরই মধ্যে সমস্ত কিছু ফাঁকি হয়ে গেলো!···বিবাহ মানে—'দেহের মিলন'—মনে

মনে মিলুক বা না-মিলুক। এই বুঝি সংসারের নিয়ম—আদি ও অকৃত্রিম! বাড়িতে দেখেছে; সেজো কাকার সংগে কাকীর মিল নেই, ঝগড়া আর গণ্ডগোল চাষাদের মতো লেগে রয়েছে অষ্টপ্রহর, অথচ সেজো কাকীমাই বাড়ীতে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছেন বেশি! পদ্ম শিউরে উঠলো নিজের দুর-বস্থার কথা ভেবে। সেজো কাকীমার জীবনের হাওয়া কী পড়লো ওর জীবনেও।

বলাই ঘুমোবার আগে জাগ্রত দেবদেবীর নামগুলো একবার উচ্চারণ করে নিলো বিড় বিড় করে। কারণ আশু বিপদের হাত থেকে তাকে বাঁচতেই হবে!

আফিসে নতুন সার্কুলার এসেছে সার্কুলার তো নয় মৃত্যুর পরোয়ানা। খড়গ ঝুলছে মাথায়। 'শতকরা তিরিশ পার্সেন্ট রিট্রেঞ্চমেণ্ট হবে সামনের মাসেই!' ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা আর কারু না হোক বলাইয়ের মনে ভয় এনেছে। তাই আজ পাঁচটা বাজার সংগে সংগে কলম ছেড়ে উঠে আসতে পারেনি। কাজ করেছে ঘাড় গুঁজে, আলো জেলে, সবাই চলে গেলে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে বড়োবাবু দেখেছে ওকে! বড়োবাবুর ছেলে-মেয়েগুলোর পড়ানোর ভার নিলে কী রকম হয়। নানা—মাইনে চাইনে। অফিসে তো মাইনে পাচ্ছিই! বাজারের এক ঝুড়ি মালদার আম কালকেই নিয়ে যেতে হবে। বিখ্যাত ফজলি আম। খেয়ে দেখুন স্যার—আপনার জন্যেই!

পদ্ম কী মাঝরাতে উঠে কাঁদছিলো? কে জানে!

ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে রাজপথ ভরে। হাতে বইখাতা, পোস্টার ফেস্টুন চোঙা নিয়ে আওয়াজ তুলে শহর প্রদক্ষিণ করে চলেছে শোভাযাত্রা। দীর্ঘ আর জমাট। চোখে মুখে রোদে রাঙা দৃঢ় শপথের হুঁশিয়ারী, পদক্ষেপে সৈনিকী প্রতিরোধ।

ইস্কুলের মেয়েরা সবারি আগে, তারপরে ছেলেরা, সব শেষে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

কর্মচঞ্চল রাজপথ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। ট্রাফিক বন্ধ। মোটর বাস রিকশা যে যেখানে ছিলো আটকে পড়েছে। উপায় নেই! পথ করে দিতে হবে সৈনিকদের, নইলে ওরা মানবে না কিছুই, ভেঙে গুঁড়িয়ে পথ কেটে এগোবে মুক্তি ফৌজের মতো।

বায়োস্কোপের ছবির মতো মিছিল ভেসে যাচ্ছে রিপোর্টার চিরঞ্জীবের চোখের সামনে দিয়ে। কবি-মনে জ্বালা ধরে গেছে ওর। এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে উদ্দাম বন্য আবেগে। হোক একটা কিছু হোক—হয়ে যাক এস্পার ওস্পার। আর ভালো লাগে না দর্শকের ভূমিকা! আগুন জ্বলে উঠুক অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে। ঘুম ভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের ক্ষুরধার তলোয়ারে খুন হয়ে যাক এই বৈষ্ণবী ভণ্ড শান্ততা।

কে ডাকলো নাম করে।

'কমল!' ঘা খাওয়া কুকুরের মতো জ্বলে ওঠে চিরঞ্জীবের চোখ।

'হ্যাঁ—'

চিরঞ্জীব হাসলো দাঁত বার করে। 'রিপোর্ট লিখছি—'দাঁতে দাঁতে খট খট শব্দ বেজে উঠলো বিশ্রী এক আর্তনাদের মতো। 'রিপোর্ট লিখছি কিন্তু সামনে হপ্তায় নিউজ এডিটারের ছাকনি গলে যেটুকু ছাপা হবে—তাতে আমার দান খুব কমই থাকবে। ন্যাশনালিস্ট পেপার—এসব ফিথ্থ কলামিষ্ট দালালদের বেশি প্রোপাগাণ্ডা দেয়া উচিত মনে করে না। এ্যান্টি গভর্ণমেন্ট ফিলিংস কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না ওরা—পাবলিক ওপিনিয়ন ক্যারী করেন কিনা কাগজগুলো তাই বুঝতেই পারছো জন-সাধারণের মঙ্গলের জন্যেই এই খবর-চাপার প্রয়োজন।' আপন মনে তিক্ত স্বরে বলে গেলো চিরঞ্জীব।

কমল হাসলো। 'জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর ওপর তোমার খুব রাগ দেখছি।'

'না না—তামাশা নয়! সত্যি আর পারি না ভাই :

My days are in the yellow leaf

The flowers and fruits of love are gone

The worm, the canker and the grief

Are mine alone!'

মিছিল এগিয়ে গেছে।

কমল মুখ ফিরিয়ে বললে, 'চলো ময়দানে মিটিং আছে—'

বন্ধুকে টেনে নিয়ে চললো কমল। আশ্চর্য ঠাণ্ডা হাত ওর। অসুস্থতার বিকৃত কীটেরা শুধু ওর দেহকেই কুরে খায়নি, মনকেও ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কবি চিরঞ্জীব—রিপোর্টার চিরঞ্জীব। কিছুতেই কি ও মধ্যবিত্তসুলভ খোকামি রোগকে কাটিয়ে উঠতে পারবে না। কেন বুঝতে পারেনা ও : মাটির তলের বিস্ফোরণের পেছনে তিল তিল করে-জমা ক্ষোভ আর পুঞ্জিত বারুদের ইতিবৃত্ত।

কেন ও এতো আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তিমুখীন! জনতাকে বিশ্বাস করতে পারে না কেন? এই ছেঁড়া ছেঁড়া বিক্ষোভগুলো সামনের আসন্ন দিনে দানা বাঁধবে, দৃঢ় হবে, তারপর সর্বাত্মকভাবে জ্বলে উঠবে শেষদিনের মতো। পুড়বে শত্রুরা সেই আগুনে। হ্যাঁ : ওদের পুড়িয়ে মারবো আমরা, যেমন করে পুড়িয়ে মেরেছে ওরা আমাদের এতোদিন!

না : বড়ো ভয় হয় কবির জন্যে। এক জাতের পাথরের মতো ঘষা খেতে খেতে একদিন একেবারে ফুরিয়ে যাবে না তো? হারিয়ে যাবে না তো চিরঞ্জীব, যেমন করে জীবনের সংগে হাতে-কলমে মুখোমুখী লড়াই করতে গিয়ে পলায়ন করেছে একদল ল্যাজগুটোনো শেয়ালের মতো জিভ চাটতে চাটতে!

না—চিরজীবকে হারালে চলবে না। ওর অপমৃত্যুকে রোধ করতেই হবে। ও-ও আমাদের ক্রমবর্ধমান ফ্রন্টের একটি অন্ধ সৈনিক। 'They are also the blind instruments of a greater end!' অন্ধ হাতিয়ারকে ধারালো করতে হবে।

সামনের বাঁকে মোড় ঘুরছে শোভাযাত্রা।

থেমে-পড়া দর্শক। মন্তব্য, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।

'ঠিক ঠিক বলেছে ওরা। শিক্ষার প্রসার করার বদলে স্বাধীন সরকারের একী খুনে নীতি'—আধা বয়সী প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'দেশটা শান্তিতে আর রাখবে না এরা। এদের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতে হয়, কতো বাহাদুর!' সিল্কের জামা গগলস-পরা যুবক।

'দাবীটা অযৌক্তিক কোথায়?'

'বাজেটে ঘাটতি পড়েছে পূরণ করতে হবে না? সরকার কী ছাত্রদের কথা ভাবেন না মনে করেন? কী করবে ওরা—টাকা নেই, টাকা নেই ষ্টার্লিং—' সিল্কের জামা আনন্দবাজারের কাটিংস্ আওড়ান।

'পুলিসের বাজেটে বরাদ্দ কিন্তু বেড়ে চলেছে···'

'যা বলেছেন দাদা। এই দেখুন অফিসারদের। দেশ ভাগাভাগির আগে যাদের মাইনে পাঁচশো ছিলো আজ তাদের হাজার হয়ে গেছে। কেন বলতে পারেন—?'

'তবু এমনি হুজুক লাগানোর কী দরকার। এই ডাইরেক্ট য়্যাকশানের ভেতরে শিশুরাষ্ট্রকে দুর্বল করার কোনই মানে হয়। বেতন বেড়েছে সকলে বুঝছে। বেশতো: গার্জেনরা কাগজে সই করে আবেদন পাঠান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হোক···'

'বুঝলেন না দাদা—ছাত্রদের মর্যালিটি একেবারে ভেঙে গেছে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে: যুবক ছোঁড়া ছুঁড়ি মিলে খানিকটে মজা ওড়ানো।

বাড়িতে তো আর দাদাদের সংগে চলাচলি করবার সুযোগ পায়না!··· কমরেড সব!' ···সিগ্রেট ধরিয়ে সিল্কের জামা হাঁটতে থাকে!···

'বন্ধুগণ—শিক্ষাপ্রসারের নামে সরকার আজ শিক্ষাসংকোচ করতে আরম্ভ করেছেন! ব্যয় বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, এর পর বেতনের হার বৃদ্ধি মানে আমাদের উপর অন্যায় জুলুম করা! নেতারা সেদিন পর্যন্ত বক্তৃতা মারফত মাইকে ঝড় তুলেছেন: আমরা গ্রামে গ্রামে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে তুলবো। তার প্রথম নমুনা কী ছাত্রদের মাইনে বাড়ানোর মধ্যে!···বছর-বছর ইস্কুলে পাঠ্যপুস্তক বদলে যাচ্ছে—শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যেন আজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যবসা চলেছে।···আমরা কন্ট্রোলে কাগজ পাই না—কেরাসিন পাইনা—মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্র্য আজ পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে।···এর প্রতিকার কী? আবেদন নিবেদনের সেই পুরানো পালা! না সে পথে মুক্তি নেই। ছাত্রদের দাবী দাওয়া ছাত্রদেরকেই আদায় করতে হবে······'

সভায় বসে বসে রিপোর্ট লিখে চলে চিরঞ্জীব।

রাত্রি।···

কালোপাথরের মতো জমাট শক্ত রাত্রি।

বাইরে এক ফোঁটা হাওয়া নেই, ঘরের ভেতরে দুঃসহ গ্রীষ্ম। এক টুকরো কালো আঁকাশ···ঘোলাটে মেঘে ঢাকা···

কমলের চোখে ঘুম নেই!

অন্ধকারে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে, চোখদুটো জ্বালা করছে সারাদিনের উত্তেজনায়। মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে—একটা মাংসপিণ্ডের মতো বোবা অনুভূতি।

ঘুম আসছিলো বিলম্বিত লয়ে, যেমন করে ঝিমোনি আসে নেশাগ্রস্ত

মাতালের। চেতনা ডুবছে যেন ধীরে ধীরে, স্নায়ুমণ্ডলী অবশতায় ঝিম ঝিম করছে, অস্পষ্ট বিবর্ণ হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি। আর একটি মুহূর্ত—বোধহয় ঘুমিয়েই পড়তো ও মাতালের চরম আচ্ছন্নতার মধ্যে।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল কমল। কান খাড়া করে দিলো শিকারী খরগোসের মতো। দোরে কড়া নাড়ার শব্দ, চাপা, সতর্ক।

রাতের খামে মুড়ে কী এলো দোরে গোপন লিপি?

'কমল দা—কমল দা—' ফিশ ফিশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দোরের পেছন থেকে।

না আর ভুল নয়! কমল তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললো।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তি।

'ইসমাইল—'

'হাঁ: একটু আগে পুলিস ইউনিয়ন আফিস চড়াও করে কুড়িজন শ্রমিককে ধরে নিয়ে গেছে। কমরেড সিদ্দিকের নামে ওয়ারেণ্ট—ও ভেগে পড়েছে!'

'পুলিসের হঠাৎ এ-ভাবে চড়াও হওয়ার কারণ?'

'আজ বিকেলে পিকেটিং করবার সময় কয়েকজন দালালদের সংগে মারপিট বেধে যায়। ইটপাটকেল সোডার বোতল—ছোরা ছুরিও চলে। দালালদের কয়েকজন জখম হয়েছে। পুলিস এসে সেখানেই সিদ্দিককে অ্যারেস্ট করে—আমরা কয়েকজন শ্রমিক মিলে হৈ হৈ করে সিদ্দিককে ছিনিয়ে নিয়েছি ওদের হাত থেকে। তারপরেই ইউনিয়ন অফিস হামলা!...'

'ধর্মঘট?'

'চলছে। তবে শ্রমিকদের অনেকেই...'

'হুঁ...'

'কাল একবার যাবেন বস্তিতে...আচ্ছা সালাম—'

কমল ফিরে এলো আবার বিছানায়।

মাথাটা আশ্চর্য বোবা হয়ে গেছে। নাঃ আজকের রাত্তিরের মতো অবসর। টলতে টলতে মাথাটা চেপে ধরে দেহটাকে ছুঁড়ে দেয় ও বিছানার ওপরে।

রাত নামে।

অনেক—অনেক রাত। সূর্য ওঠে।

মহানন্দার বুকের ওপর দিয়ে অনেক জল পদ্মার গিয়ে মেশে।

অনেক—অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো পদ্মর। রোদের তেজ ঝিমিয়ে এসেছে।

কদিন থেকে শরীর ভালো যাচ্ছিলো না ওর। কোনো অসুখ নেই—অমনি কেমন কিছু-ভালো-না-লাগা! একটানা একঘেয়ে কেটে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ির জীবন···নতুনত্ব নেই, দিদিমার রামায়ণ-পড়ার মতো রোজ পুনরাবৃত্তি। কেমন একটা অভাব-বোধ···কী যেন চাই—নাম-না-জানা কী একটা নিগূঢ় চাহিদা। এই বোধহয় জীবন!

বাবা একখানা চিঠি লিখেছেন সেদিন: 'কেমন আছিস? হ্যাঁরে এমন করে ভুলে যেতে হয় আমাদের! শ্বশুরবাড়ির আহ্লাদের মধ্যে আমাদের আর মনে পড়ে না, না?'

হ্যাঁঃ ভালো আছে পদ্ম, ভালো আছে বৈকী! দুবেলা দুটো ভাত, স্বামীর সোহাগ···আর কী চাই?

ঠাকুরপো কিন্তু আশ্চর্য লোক! বলে: 'এইই নাকি জীবন নয়!' এইই জীবন নয়? কেন—এর বেশি আর কী মেয়েদের দাবী থাকতে পারে, আর বাড়তি কী কামনা থাকতে পারে?···'স্বামী-দেবতা···'সোহাগ—···হ্যাঁ, সোহাগ বৈকী! সেজো কাকা কী কাকীমাকে সোহাগ করেন না? এইতো ভালোবাসা! বছরে বছরে নতুন নতুন কচি অতিথি···এতো ভালোবাসারই ভগবৎ পুরস্কার! বরং অনেকের চেয়ে ওর স্বামী ভাগ্যে

জোর আছে—সিঁথেয় চওড়া করে সিঁদুর পরার জন্যেই নিশ্চয়!' 'বকুলফুলের' স্বামী ওকে মারধর করে, কিন্তু তাতে করে ওদের প্রেম তো আরো জমাট বেধেছে! সেবার সই বাপের বাড়িতে ফিরে আসে একগা গয়না, তোরঙ ভর্তি শাড়ি আর বিয়ের জল-পড়া টৈটম্বুর শরীর নিয়ে। 'উনি—জানলি সই—কী বলবো তোকে না চাইতেই দেবেন এ—তো সব! আমি বলি: এতো খরচা করো না গো—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে তো? ··তা ভাই উনি কী বলবো তোকে···এতো পাগলা মানুষ আর দেখিনি কখনো!' 'খুব ভালোবাসে তোকে, না?'—জিগ্যেস করেছিলো পদ্ম। থমকে গিয়েছিলো সই, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলো পদ্মর দিকে। ওর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে পদ্মই নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করছিলো। সই কিন্তু দমবার পাত্র নয়। মুখ গোঁজ করে বলেছিলো: 'কী যে বলিস সই তার মানে হয় না। স্বামী বউকে ভালোবাসবে না তো কী'···কী অসভ্য কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলো সই।···ভালোবাসা! হ্যাঁ নিশ্চয়ই—মারধর?—ও বোধ হয় ভালোবাসার চরম অংগ একটা।

পদ্মর স্বামী মারে না।

পদ্মর এক-এক সময় 'বকুল ফুলের' সৌভাগ্যই পেতে ইচ্ছে করে। এর চেয়ে স্বামী ওকে মারধর করলেও বোধ হয় বেশি ভালোবাসতো ওকে। অন্তত জীবনে একটা আত্মপীড়ন থাকতো, উত্তেজনা থাকতো—একেবারে ডোবার জলের মতো স্থির হয়ে যেতো না ওর দাম্পত্য জীবন। তাহলেও ভাবতে পারতো: লোকটার হৃদয় আছে, প্রাণহীন একটা রক্তশোষক নয়!···

ওর স্বামী ওর কোনো পৃথক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চান না। ধর্মভীরু অসুস্থ একটা বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক। বংশ বৃদ্ধির জন্যেই বিবাহ··· সারাদিন খেটেখুটে আসা এঞ্জিনকে কাঠ-কয়লা দিয়ে গরম, চালু করে

রাখতে হবে দৈনন্দিন পরিশ্রমের শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে। বউয়ের প্রয়োজন শুধু রাত্তিরে উত্তপ্ত বিছানায়। 'মেয়েদের মন— ?' হাঃ হাঃ হাঃ। ও শুধু নাটক নভেলে লেখে···তারি জন্যই তো কুমারী মেয়েদের নাটক ছুঁতে নেই !···পদ্ম ভাবে : 'বকুল ফুল' সই কী আমার চেয়েও অসুখী !

ঠাকুরপো বলে : 'এইই নাকি জীবন নয় !'

তবে ?

'এই জীবনের চেহারাকে একেবারে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পাল্টাতে হবে।'

পাল্টাতে হবে—কী করে ?

ঠাকুরপো বেশ বলে কিন্তু। ও কী আমার মনের চেহারা বাইরে থেকে বুঝতে পারে ! বুঝতে পারে তিল তিল করে কী ভাবে আমি ক্ষয়ে যাচ্ছি, ফুরিয়ে যাচ্ছি। মদনদা দাবী করেছিলো পুরনো সাথীত্বের, বুভুক্ষুকে খেতে দিয়েছিলো ও। স্বামীর দাবী চির শাশ্বত, আমৃত্যু—স্বামীও খেতে দেয়।

ঠাকুরপো বলে, 'মানুষের এই সম্পর্ককে নাকি একেবারে ওলোট পালোট করে দেয়া যাবে। এবং সেদিন আসছে !'

হাসলো পদ্ম : কবে ?

'কে যায়—?' ঘর থেকে চীৎকার করে উঠেছে দ্বিজনাথ।

'বাবা—আমি—'

'কে ? কমল শোন্ শোন্—'

কমল বাবার ঘরে এসে ঢুকলো।

চোখ দুটো নিভন্ত উনুনের মতো শান্ত বাবার। মনে হচ্ছে : সারাদিন কী একটা চিন্তা নিয়ে লড়াই করেছেন তিনি।

দ্বিজনাথ লাহিড়ী। মাইনর ইস্কুলের হেড পণ্ডিত। চৌদ্দ বছর

ইস্কুলে সরস্বতীর অচলা আরাধনা। শেষ দৃশ্যে যবনিকা-পতন। তিরিশ টাকার পরিমাপে আটকানো জীবনের লক্ষ্মী। সংসারের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য—মাসোহারার অপরিবর্তনশীল অংক…পণ্ডিতের জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি আধা উন্মত্ততায় আর সব খোয়ানোর নিঃস্বতায়।

'বাবা—?' কমল দাঁড়াতে পারছে না। মস্তিষ্কে লেলিহান আগুন সাপের মতো কোঁশ ফাঁশ করে উঠতে চাচ্ছে যেন ওর।

'দ্যাখ—দ্যাখ—পড়ে দ্যাখ। দেখেছিস আজকের খবরের কাগজ…? এই দ্যাখ—'

কমল দেখলো।

'না না—জোরে জোরে পড়, জোরে খুব জোরে—'

কমল পড়লো। "প্রাইমারী শিক্ষকের আত্মহত্যা!"…শিক্ষকের স্ত্রী জানাইতেছেন যে নিদারুণ দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার স্বামী ঘরে কড়িকাঠের সংগে ফাঁসি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।… 'আমার স্বামীর মাসিক বেতন আটাশ টাকা। আজ তিন মাস ধরিয়া ক্রমাগত দরখাস্ত করিয়া টাকার কোনো প্রাপ্তির সংবাদ না পাইয়া স্বামী আত্মহত্যা করিয়া জীবন জুড়াইয়াছেন। আমার সংসারে তিন ছেলে এক মেয়ে—প্রত্যেকটি নাবালক—তাহাদের লইয়া আমার জীবন যাত্রা কি করিয়া চালাইব।'…ঘটনার শেষে আরো একটু 'আইরনি' আছে। (অন্তত শিক্ষা বিভাগের এইটুকু কৌতুকবোধ, 'হিউমার' না থাকলে কী করে চলে!) শিক্ষকের অপমৃত্যুর দু'দিন পরে হঠাৎ অনুগ্রহের মতো পিওন ঐ তিন মাসের মনিঅর্ডার লইয়া গিয়া কৃতার্থ করে!

দ্বিজনাথ থমথমে গলায় প্রশ্ন করলো: 'কী পড়লে, পড়লে?'

'পড়লাম—?'

'আমাকে কী করতে বলো—এঁ্যা? আবার ধরবো নাকি সরকার

বাহাদুরকে? বলবো—ওই তিরিশ টাকার বেতনই সই···আর বে-আদপী হবে না বাবা, সরকার সেলাম—' দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর ভুতুড়ে শোনায়।

···মাইনর ইস্কুলের পণ্ডিতের ইতিহাসের শেষের যুগগুলো একটু বিচিত্র।

ইনস্পেকটার এসেছিলো ইস্কুল পরিদর্শন করতে। শিক্ষকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৃতার্থের হাসি হাসছিলেন।

'আপনাদের কোনো অভাব-অভিযোগ নেই তো?'

'না স্যার—আজ্ঞে বেশ আছি—'

'কী পণ্ডিতমশায় আপনার শরীর ভীষণ খারাপ মনে হচ্ছে?'

দাঁত বার করে হাসলেন পণ্ডিত মশায়: 'না স্যার—বেশ ভালই আছি। খাওয়া-পরার কষ্ট ছাড়া···বেশ ভালো আছি—'

ইনস্পেক্টার ভ্রূকুটি করে উঠেছিলেন, 'আই মিন—খাওয়া পরার কষ্ট কেন?'

সংস্কৃত-পড়া সেকেলে পণ্ডিত। মুখ বড়ো অশ্লীল আর অভদ্র।

বলেন, 'চলে না স্যার—এই তিরিশ টাকায়···'

'এ্যাঁ! চলে না—' ইনস্পেকটার যেন সাপের গায়ে পা দিয়েছেন: 'চলে না! তবে আমাদের 'উপরে' জানান না কেন? আই মিন—আমরা আছি কী করতে। আচ্ছা—আপনার কথা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে পাঠাবো—'

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং বলাবাহুল্য মাত্র।

মাসখানেক বাদে মোটা খাম এলো হেড মাস্টারের কাছে। সে-খামে টাইপ করা নির্দেশ: হেড পণ্ডিত শ্রী দ্বিজনাথ লাহিড়ীর অসুস্থতা এবং অক্ষমতার দরুণ তাঁহাকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া কাজ হইতে অবসর গ্রহণের নির্দেশ জানানো হইতেছে।···কর্তৃপক্ষ পণ্ডিত মশায়ের দীর্ঘ

অধ্যাপনায় কৃতজ্ঞ। এতো শীঘ্র তাঁহাকে হারানোর জন্তে তাঁহারা সবিশেষ আন্তরিক দুঃখিত !···ইত্যাদি।

দ্বিজনাথের মনে পড়ে ফেলে আসা ইস্কুল জীবনের একটি ছোট্ট স্মৃতি। কঠোর নিষ্করুণ স্মৃতি।

কোন এক শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন। জনপ্রিয় শিক্ষক জিলা ইস্কুলের—পণ্ডিতমশাইও গিয়েছিলেন সেখানে।

নুরুল আমীন ! এক মুসলমান ছাত্র।

বক্তৃতা দিতে দিতে ইংরিজী একটা উধৃতি বলেছিলো ঃ 'School teachers are no better than a dog !'

কী কুকুর বলা ! ছেলেটির ঔদ্ধত্যে লাফিয়ে উঠেছিলেন হেডপণ্ডিত দ্বিজনাথ বাবু ঃ এ দস্তুর মতো অপমান—এমন ছেলেকে রাস্টিকেট করা দরকার !

ক্ষেপে উঠেছিলো শিক্ষক সমাজ।

ছেলেটি কিন্তু প্রতিবাদ করেছিলো ঃ 'আপনাদের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমশায়—আমি বলতে চেয়েছিলাম সত্যিকার কুকুরের চেয়ে কোনো বেশি সম্মান নেই শিক্ষকদের !··'

ওকে আর বলতে দেওয়া হয়নি। পরে নাকি ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় !···

হা হা করে হেসে উঠলেন দ্বিজনাথ ঃ 'খেতে না পাই—দেউলে জমিদারের মতো মানের অহংকার আছে পুরো !' দ্বিজনাথের হাসি যেন থামতে চায় না—যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শুকনো খরখরে হাসি, কাঠখোট্টা, ভয়ংকর।

'বাবা !' কমল চীৎকার করে উঠেছে সজোরে। মাথাটা কী পুড়ে যাচ্ছে ওর !

এক লহমায় থেমে গেলো মানুষটা। ভিজে বারুদের মতো স্যাঁতসেঁতে

হয়ে গেলো বিজনাথ। তারপর কমলের হাত দুটো চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলো ওকে।

'কবে—কবে—কবে ?'

'বাবা—' কমলের চোখেও যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।

এক ঝটকায় বাবার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও।

কবে—কবে—কবে ? এক মুমূর্ষু চীৎকার—থেঁতলানো চাকার তলা থেকে আহত কুকুরের চীৎকার।

রাজপথ।

কমল ছুটে চলে উধ্বর্শ্বাসে।

'কবে—কবে—কবে ?' হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা আর্তনাদ করে উঠেছে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। বাবা···কবি চিরঞ্জীব···সমাজের দ্রুততর পট পরিবর্তনকে কেন ধরতে পারছে না ওরা ? জনতার বন্যা উদ্বেল দুর্বার গতিতে ছুটে আসছে···নদীর ক্ষীণ কটি আর বেষ্টন করে রাখতে পারবে না সে-বন্যাকে, নদীর তটে তটে পাড় ভাঙার কাহিনী, ধ্বসে যাওয়ার ইতিবৃত্ত গড়ে উঠবে, ভেঙে চুরে নদী আপনার পথ করে নেবে, বাঁক ঘুরবে নদী, নতুন মোড়—নতুন আকাশ, নতুন মাটি। বিপ্লব !

কলকাতার রাজপথে পোস্টার নিয়ে, ভুখা ব্যাজ পরে, বেরিয়ে পড়েছে শিক্ষকের দল। খেতে চাই ! ভাত কাপড় রুটির দাবী···হাজার হাজার ক্ষুধিত শিক্ষক সমাজের ডাক আজ ছড়িয়ে পড়েছে রাজপথের দুধারে, জনতার কণ্ঠে। ছাত্ররা বেরিয়ে এসেছে ভুখা শিক্ষকদের দাবীতে—সমর্থন করেছে কলকারখানার বৃহত্তর শ্রমিক-সমাজ !

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকী পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল আদর্শ আর ধরে রাখতে পারছে না মধ্যবিত্ত শিক্ষক সাধারণকে 'অভাবের উধ্বে থাক'···'বুনো রামনাথের আদর্শ···' 'শিক্ষকেরা জাতির মেরুদণ্ড—তাদের এই উচ্ছৃংখল

আচরণ ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি, অসংযম আনবে—' 'ডাইরেক্ট য়্যাকশন শিক্ষকদের আদর্শের পরিপন্থী···'

কে বলে : 'দুনিয়ার শিক্ষক-সমাজ ?' কথাটা অস্পষ্ট। সেটা হবে : 'দুনিয়ার শ্রেণী-শিক্ষক সমাজ'! কায়েমী স্বার্থের literary yes.-man-এর দল এম. এ. পি. এচ. ডি. ডিলিট এণ্ড কোং জোর টিনের কানেস্তারা বাজিয়ে চলেছে।

'কমল—'

'শ্যামলী!' যাক বাঁচা গেলো। এই মুহূর্ত্তে এমন একটা য়্যাকসিডেণ্ট না হলে ওর মস্তিষ্কে বোধ হয় বিস্ফোরণ আরম্ভ হতো!

শ্যামলী কাছে এগিয়ে এলো। 'এই যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম কমল। আজকের দিনটা খরচ করবার ভার কিন্তু আমাকে দিতে হবে তোমায়···'

কমল হাসলো। 'বাজে খরচ করবে না তো ?'

'একটা দিন বাজে খরচই করলে!'

'বলো—কোথায় যেতে হবে ?'

'পাপড়ি আজ কলেজে ধরেছে তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে ওদের বাড়িতে। ওর এক কাকা যুদ্ধে গিয়েছিলো, বহুদিন মান্দালয়ে ছিলো, ফিরে মস্তো পার্টি দিয়েছেন আজ সন্ধ্যায়, তোমাকে আর আমাকেও তাই নিমন্ত্রণ করেছে।'

'নীলবাতি-ঘেরা ড্রয়িংরুমের পার্টি। মানে ভোজের সংগে যেখানে এক টেবিলে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনী আলোচনা থেকে যুদ্ধের গল্প পর্যন্ত পরিবেশন করা চলে। গির্জেতে বসে যেন ধর্মালোচনা করছে এরকম গম্ভীর ওদের মুখের চেহারা। উঃ—'

'যাবে না তুমি? বেশ। আমি কথা দিয়েছি ওকে—'শ্যামলীর কণ্ঠে অভিমান।

'আরে রাগ করলে! বোকা কোথাকার—চলো। লোকে সার্কাস দেখতে যায়, ছু'তে যায়, আজকেও না হয় একটা 'এক্সকারশান' হোক।'

এটর্নী নজ। ঝক ঝকে ইট পাথরগুলো থেকে মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের পরিমাপ করতে পারা যায়। গেট পেরিয়ে এক ফালি লন্... কতোগুলো দামী মোটর অপেক্ষা-রত, সেখান থেকেই উৎসবের কলহাস্য কাচ ভাঙার অনুকরণে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

এদের দুজনকে দেখে ছিমছাম বেয়ারাটা সেলাম করতে ইতস্তত করলো। তবু কষ্টে একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'আইয়ে—'

ড্রয়িংরুম। মাঝখানে ডিমের মতো একটা মস্ত টেবিল—সেটাকে ঘিরে চেয়ারে পুরুষ নারীর সন্নিবেশ। ইভিনিং ইন প্যারিস, ইয়ার্ডলি, ওডিকলোন, কিউটিকুরার সুতীব্র বিজ্ঞাপন। পাইপ সিগার আর সিগ্রেটের উগ্র সুরভি।

এদের দেখে হঠাৎ আলোচনার সুর কেটে গেলো ড্রয়িংরুমবাসীদের।

কমলের গায়ে টুইলের হাফসার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল। শ্যামলীর পরনে শস্তা ছাপানো শাড়ি, প্রসাধনের কৃপণ বিলাসে মূর্তিমান ছন্দঃপতন।

শ্যামলী এগিয়ে গিয়ে সামনের তরুণীকে অনুরোধ করলো পাপড়িকে খবর দিতে।

খবর পেয়ে ছুটে এল পাপড়ি দে। ওদের দেখে প্রথমে চোখদুটো উজ্জল হয়ে উঠেছিল ওর, পরমুহূর্তেই নিভে গেলো। শ্যামলীটা ওর সম্ভ্রম নষ্ট করলো দেখছি। ওকি এমনই অদ্ভুত! ক্লাসে এরকম শাড়ী পরে আসে বলে কী পার্টিতে এরকম কাপড় পরে আসবে ও। কি ক্ষতি ছিলো একখানা দামী শাড়ী পরে এলে, না হয় আসতো একটু দেহটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে। ইনডিসেন্ট! আর ঐ কমলবাবু! বোরিং!

'এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি—'পাপড়ি যেন তেতো কুইনিন গিলে চলেছে; 'কাকা এ—আমার ক্লাশমেট শ্যামলী মজুমদার। ক্লাশের জুয়েল; আর উনি কমল লাহিড়ী—প্রগতিশীল লেখক...'

মিষ্টার চন্দর খিড় খিড় করে বলে উঠলেন, 'লেখক আবার প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল বলে তো শুনিনি কোনদিন। দিনদিন কি হচ্ছে! কোনদিন শুনব মানুষ দুভাগ হয়ে গেছে। ষ্ট্রেঞ্জ!'

কমল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো: 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মানুষ আজ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। লেখকেরাও যখন মানুষ তখন তারাও দুই ভাগ!...'

'দিস ইজ নো জোক!' মিষ্টার চন্দর গম্ভীর চালে মন্তব্য করলেন।

কমল হাসলো। 'জোক আমিও করছি না মিষ্টার...দিস ইস্ হিস্ট্রি!'

'ইস বাবা: থামুন—তর্ক পরে হবে—'পাপড়ি মাঝপথে থামিয়ে দিলো আলোচনাকে।

খানশামারা খাবার নিয়ে এসেছে। সকলে সোজা হয়ে বসলো। ভোজন পর্ব শুরু হলো। ডিনারের সময় মুখ বঁজে খাওয়া বর্বরতার পরিচায়ক। তাই আলোচনা আরম্ভ হলো। পরিচয় হলো এখানে সবরকম আলোচনা হতে পারে।...

সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কলা, ধর্ম প্রত্যেকটি বিভাগের এক একজন দিকপাল বর্তমান। কিন্তু বোধ করি সে সব আলোচনা আজ জমবার ফুরসৎ পাবে না। কারণ পাপড়ির কাকা প্রস্তুত হচ্ছেন: যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বলবেন তিনি। ক্যাপটেন দে—আই. এ. এম. সি।

'আপনারা হয়তো কেউ যুদ্ধ দেখেননি—কারণ যুদ্ধ দেখা আপনাদের সম্ভবও নয়—'একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ক্যাপটেন দে:

'বেগমপেট থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে এখানে—আসামের জঙ্গলে—'যুদ্ধের বর্ণনা করে চলেন ক্যাপটেন।

কমলের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে যুদ্ধের দৃশ্য।

"···ক্রমে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসছে। নিজে বক বক করে চলা ছাড়া আর উপায় কী! আমি সেই লোকটার কাছে গিয়ে বলি: 'কমরেড, আমি তোমায় মারতে চাইনি। যদি তুমি আবার এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ো তো আমি ছুরি তুলবো না। তুমি আমার কাছে ছিলে কী তো কী নিছক একটা কল্পিত—তাকেই আমি ছুরি মেরেছি। কিন্তু এখন এই আমি প্রথম দেখছি তুমিও আমারই মতো মানুষ। ছুরি মারবার আগে আমি ভেবেছিলুম তোমার বোমা, তোমার সঙ্গীন, তোমার বন্দুকের কথা—এখন স্পষ্ট দেখছি তোমার মুখ, যেন তোমার স্ত্রীর মুখও দেখছি এবং দেখছি তুমি আমি দুজনে দুজনার বন্ধু। আমায় ক্ষমা করো কমরেড—অনেক বিলম্বে আমাদের চোখ ফোটে। কেন ওরা আমাদের বলে না যে তোমরাও আমাদের মতো হতভাগ্য, তোমাদের মা-রাও আমাদের মা-দের মতো ভাবনায় ভাবনায় কাল কাটান, আমাদের মৃত্যু ভীতি দুজনেরই সমান, মৃত্যু যন্ত্রণাও একই রকম। ক্ষমা করো কমরেড: তুমি আমার দুশমন হবে কী করে? যদি আমরা এই বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফৌজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াই, তাহলে কাট আর আলবের্টের মতো তুমিও তো আমাদের একজন।

ছাপাখানার কম্পোজিটার Gerard Duval কে আমি খুন করেছি।

বেলা পড়ে গেলে আমি খানিকটা ঠাণ্ডা হই। মৃত লোকটিকে আমি শান্ত স্বরে বলি: "Comrade, to-day you, to-morrow me. But if I come out of it, comrade, I will fight against this, that has struck us both down; from you taken life and from me? Life also. I promise you, Comrade, it shall naver happen again!"

ক্যাপ্টেনের কী এক কথায় সকলে এক ছাঁচে হো হো করে হাসতে আরম্ভ করেছে।

কমল চমকে উঠলো। ওর চোখের সামনে থেকে 'ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের' পাউলএর স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেলো।

চোখ ফেরাতেই কমল দেখলো পাপড়ি চেয়ে রয়েছে ওর দিকে—আগুন ঢালা সে চোখের দৃষ্টি। কী ভাবছে লোকটা? ওর গভীর চোখের পর্দায় কিসের ছায়া দুলছে।

পার্টি ভাঙলো।

রাত হয়েছে।

কমল ওরা উঠলো।

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো পাপড়ি।

'গুড নাইট'—পাপড়ি ছুঁয়েছে কমলের হাতটা। মৃদু চাপের উষ্ণ স্পর্শ। চোখে ঐন্দ্রজালিক হাসি।

কমল হাত তুলে জানালো নমস্কার।

'এসো শ্যামলী—রাত্রির রাজপথে নেমে পড়লো ওরা।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলো পদ্মর।

কুয়াশার মতো একটা ফিকে অন্ধকার তখনো জড়িয়ে আছে চারদিক, সামনের নিমগাছটা ধোঁয়াটে আবছায় ঢেকে আছে।

পাশে স্বামী নাক ডাকিয়ে চলেছে। অতি দাম্ভিক আত্মম্ভর বীর পুরুষটিকে এখন কেমন গোবেচারা দেখাচ্ছে। কী কুৎসিৎ ওর ঘুমোবার ভংগী, কালিপড়া চোখ দুটোতে লাম্পট্যের আত্মতৃপ্তির ছায়া। এই লোকটির গা মিলিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়, আঠার মতো লেপটে থাকে লোকটা অশ্লীল পাশবিকতার বর্বর লালসা নিয়ে। যতক্ষণ জেগে থাকে চোখ

মেলে চাইতে পারে না পদ্ম। স্বামীর বনেদী অধিকারকে নি[illegible] [illegible] মেনে নেয় ও।

অন্যদিন আরো একটু ঘুমিয়ে থাকতো। কিন্তু আজ আর ভালো লাগে না। রাত্রির ছাড়া সেমিজটা গায়ে চড়িয়ে, পরনের কাপড়টা সংবত করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো পদ্ম।

দোর খুলে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে একপাল কুকুরের বীভৎস প্রতিবাদের ঘেউ ঘেউ ভেসে এলো। নিস্তব্ধ ভোররাত্রে কুকুরের চীৎকার কেমন বিশ্রী ভাবে বেজে উঠলো পদ্মর কানে। কেমন একটা কুতূহল বেড়ে উঠলো ওর মনে।

জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই চমকে উঠলো পদ্ম। ধড়মড়িয়ে ছুটে এলো ঘরে।

'ওগো—ওগো—' বলাইকে মরীয়া ভাবে ঠেলা দিয়ে উঠলো ও।

বলাই বিরক্তির সংগে পাশ ফিরে শুলো।

'ওগো—শুনছো—'পদ্মর গলার স্বর শুকিয়ে গেছে আতংকে। 'সর্বনাশ হয়েছে—ওঠো—'

ধড়ফড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো এবার বলাই

'কী হয়েছে?' বলাই নেশাখোরের মতো বদখত আওয়াজ করে উঠেছে।

'পুলিস···পুলিস বাড়ি ঘের'ও করেছে!' পদ্মর মুখ মরার মতো শাদা।

'এ্যা!' বলাই কেঁপে উঠেছে ভয়ে। 'ওঃ—' আর্তনাদ করে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে: 'স্টুপিড রাসকেল কমলটার জন্যে! হতচ্ছাড়া কী যে করে আসবে কোথায়! ওঃ—এখন আমি কী করি!'··· হৃষ্টপুষ্ট লোকটা বাঁশপাতার মতো কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

পদ্মর ভয় হয় কেঁদে ফেলবে না তো!

না—একবার বাইরে—'

'খবরদার দোর খুলো না। পাগল হয়েছো! আমাকে ছাড়বে নাকি! হাজতে নিয়ে যাবে—আচ্ছা করে ধোলাই দেবে। আর চাকরীটা যাবে—'

'আহা! তুমি একবার গিয়েই ত্বাখো না—'

'পাগল হয়েছো। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি চানের ঘরে লুকোচ্ছি খবরদার আমার কথা জিগ্যেস করলে বলো না—'

কাপড় সামলাতে সামলাতে ঘর থেকে ছুটে গেলো বলাই।

খট—খট —খট—বাইরে কড়া বেজে চলেছে।

পদ্ম বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ঠাকুরপোর ঘরে।

কমল উঠে বসেছে বিছানার ওপর। কড়ার কর্কশ আওয়াজ জাগিয়ে তুলেছে ওকেও।

'ঠাকুরপো!' পদ্মর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

'বৌদি—' কমল হাসলো ওর দিকে চেয়ে।

'পুলিস…পুলিস…' বিড়বিড় করে জানালো পদ্ম।

কমল হাসলো। 'জানি বৌদি—ছিঃ কাঁদছো তুমি!'

পদ্ম আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললো। 'না কাঁদিনি তো।…তোমাকে ওরা ধরতে এসেছে ঠাকুরপো…'

কমল বললে, 'তাইতো দেখছি—'

'কেন ?

'তাতো জানিনে বৌদি। তবে অনুমান করতে পারি—'

পদ্ম হৃদপিণ্ডের ধড়ফড়ানিকে কোনো মতোই শান্ত করতে পারছে না।

'দাদা কোথায় ?' কমল জিগ্যেস করলো একটু পরে।

পদ্মর বিষিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। 'চানের ঘরে লুকিয়েছেন—'

কমল হেসে উঠলো হো হো করে। 'দাদাটা ভারি ভীতু!...আচ্ছা যাক—আমাকেই দর্শন দিতে হয় দেখছি। কতোক্ষণ বেচারারা আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে—'

'ঠাকুরপো!' পদ্ম জড়িয়ে ধরেছে কমলের হাত। 'না না—তুমি যেতে পাবে না—যেতে পাবে না—' এবার অকূল অজস্র ধারায় কান্নার ভারে ভেঙে পড়ে পদ্ম।

কমল আস্তে বৌদির হাত ছাড়িয়ে নেয়। 'কেঁদোনা বৌদি ছিঃ—'

কমল ভেতরে মুখ ধুতে চলে যায়।

পদ্ম আঁচলে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকে। এ বাড়িতে যার সংগে আপন ভাবে কথা বলতে পারা যায় সে এই ঠাকুরপো। ঠাকুরপোকে হারানো এক বিরাট ক্ষতি—সে-লোকশানকে সহজ ভাবে কী করে মেনে নেবে ও।

কড়া বেজে চলে জোরে জোরে।

কমল এসে দরজা খুললো।

টাউন দারোগা আর জন ছয়েক কনস্ট্বল।

'কাকে চাই— ?'

'কমল লাহিড়ীকে—আরে আপনিই!' দারোগা খুশিতে বিগলিত হয়ে উঠলো: 'একসকিউজ মি—কী করবো বলুন—ডিউটি ইজ ক্রুয়েল...'

'গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে কর্তব্যের কথা বলুন—'

'আপনাকে কষ্ট করে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে—'

'য়্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে?'

'আরে মশাই—য়্যারেস্ট করতে আসিনি আপনাকে—এমনি একটা ইনভেস্টিগেশন...' দারোগা লঘুকণ্ঠে বলে উঠলো।

কমল বাঁকা হাসি হাসলো। 'ইনভেসটিগেশন!.. ইনভেসটিগেশন করবার আর সময় পাননি। এই শেষ রাত্রে—'

'কী করবো বলুন—তাছাড়া তো আপনার দেখা পাওয়াই ভার—'

'হুঁ···আচ্ছা অপেক্ষা করুন। আসছি—'

কমল ভেতরে চলে এলো। ভেতরে তখন সাড়া পড়ে গেছে। দিদিমা কাঁদছে, বৌদি রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়ে ঘোমটার ভেতরে চোখ মুছছে। একমাত্র বাবা খবর শুনে গুম মেরে গেছেন। দাদা বোধহয় চানের ঘর থেকে বেরোয়নি এখনো।

'কই—বৌদি চা হলো?' কমল আবহাওয়াটাকে লঘু করতে চেষ্টা করলো।

চা খেয়ে বেরিয়ে গেলো কমল।

পাশে পাশে ইনস্পেকটার, পেছনে কনস্টবল।

রাজপথ। নির্জন, সুপ্ত।

চানের ঘর থেকে এবার বেরিয়ে পড়েছে বলাই।

গাজনের নাচ আরম্ভ করেছে লোকটা বারান্দার ওপর।

'উঃ—রাসকেলটা জ্বালিয়ে খাবে আমাদের। চাকরীটা খাবে আমার! উঁ রে বাবাঃ, পুলিস!'

দিদিমা বারান্দায় হেঁট হয়ে বসে ঘনঘন চোখ মুছছেন।

পদ্মর চোখে অশ্রু নেই! সামনের ঐ লোকটার কাণ্ড দেখছে ও। থ হয়ে গেছে একেবারে। কেমন হাসি পাচ্ছে বলাইকে দেখে। হাসি নয় দুঃখ—ঠিক দুঃখ-ও নয়, করুণা হচ্ছে লোকটিকে দেখে। আজ যেন পরিষ্কার করে বুঝতে পারলো : ঐ দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা লোকটার বাইরের আবরণ মাত্র, খানিকটা উঁচুদরের আত্মতুষ্টির মোড়লী! ভেতরের লোকটা একটা ফাঁকি, সামান্য কাঠখড়ের ফাঁপা বুনোনি—যাত্রার দলের সেনাপতি মাত্র! 'পতি পরম গুরু'—কথাটার মধ্যে ভক্তির ভাব আছে, কিন্তু মানুষটার ওপরে সম্ভ্রম না-এলে ভক্তি গজাবে কোথা থেকে—? রঙচঙ-করা

প্রতিমাকেই লোকে ভক্তি করে কিন্তু নদীর জলে ভেসে যাওয়া খড়ের খুলোনিটা দেখে কী লোকে ভক্তি করে ?

বলাই প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে : 'আর কখনোই আমি ওকে বাড়িতে পা দিতে দিচ্ছি না। আই স্যাল ড্রাইভ হিম আউট।···রাস্কেল আমারই খাবে, আমারই বুকে বসে দাড়ি উপড়োবে !'···

'বলাই !' ঘরের ভেতর থেকে বেগে বেরিয়ে এসেছে দ্বিজনাথ। ক্ষুধিত নেকড়ের মতো জ্বলছে ওর চোখ। 'ভেবেছো কী আমি মরেছি ? বাঁদরামি করবার জায়গা পাওনি, না ?'

বলাইয়ের অতো দাপট এতোটুকু হয়ে গেলো ভয়ে। মুখ কালি করে ল্যাজ গুটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ও।

দ্বিজনাথও পেছনে পেছনে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

পদ্মর কী জানি মনে হয় : এই যেন চাইছিলো ও। অন্তত তার শ্বশুর ওকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

দুপুর বেলা দুটোর সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এলো কমল।

বৌদি ছুটে এলো।

'ছেড়ে দিলো !'

'হ্যাঁ দিলোই তো—' কমল হাসলো ছোটো করে।

পদ্মর যেন বিশ্বাস হয় না।

'তুমি আমার 'অক্টোপাস' গল্পটি পড়োনি বৌদি ?'

'পড়েছি তো।'

'সেইটে নিয়েই ওদের আক্রোশ। বলে : ওটাতে নাকি স্যান্টি গভর্ণমেন্ট হেট্রেড—অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার ইন্ধন জালিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া—ওতে চাষীদের অনেক গুপ্ত আন্দোলনের আভাস রয়েছে। যার থেকে ওরা ধারণা করেছে আমার নিশ্চয়ই সেসব আন্দোলনের

সংগে যোগাযোগ আছে নইলে এমন গল্প লিখতে পারি কী করে। তাই বলছিলোঃ গাঁয়ের সেই গুপ্ত আন্দোলনের কেন্দ্রগুলোর খবর দিতে।··· ছাখোদিকি, আমি ভালোমানুষ—সাহিত্যিক মানুষ—বাড়িতে বসে বসে লিখি,আমি কী করে সে সব খবর জানবো। ওরা ছাড়বে না—জেরার পর জেরা। বেচারারা শেষে নাজেহাল হয়ে ছেড়ে দিলো। অবশ্য শাসিয়েছে এ যাত্রা রক্ষা পেলেও সামনের বারে ধরবেই।·· আমি মনে মনে সরকারের মহিমা কীর্তন করতে করতে বেরিয়ে এলাম—'

পদ্ম ওর কথার খানিকটা বুঝলো, খানিকটা বুঝলো না। অনেক ভেবে হঠাৎ বোকার মতো জিগ্যেস করলো, 'গল্পও লিখতে দেবে না ওরা ?'

কমল বললে, 'দেবে তো। তবে গল্পের মধ্যে কোনো মতবাদকে প্রচার করতে দেবে না। অবশ্য গান্ধীবাদ ছাড়া·· '

'তোমরা কী প্রচার করো—?'

'সে কথা তো একদিন বলেছিলাম বৌদি। আমরা জনসাধারণের জন্যে লিখি। কাজেকাজেই যে.মতবাদ একান্ত জনসাধারণের, তাই প্রচার করি !'

'তবে ?'

'তবে কী ? আহা, সে-রাজনীতি। বলবো কালকে। এখন চলো—খেতে দাও দিকি। সারাদিন খেতে দেয়নি। কেবল চারখানা লুচি আর রসগোল্লা '

'ইশ্, তাই নাকি ! চলো চলো—চান করবে না ?'

'সে করবোখন সন্ধ্যেয়। এখন খেতে না-পেলে হার্টফেল করতে পারি।'

পদ্ম ছুটলো খাবার ঘরের দিকে।

জোরে জোরে পা ফেলে চলেছে শ্যামলী।

ওর মাথায় অজস্র চিন্তা জট পাকিয়ে উঠেছে। আজ সকালে হঠাৎ

শিবানীর এই চিঠি : 'শ্যামলীদি—এই দুঃসময়ে তোমার বড়ো প্রয়োজন। একবারটি আসবে কাল?'...হঠাৎ কী হলো ওদের? বড্ড চাপা মেয়ে শিবানী—মধ্যবিত্ত মেয়েদের বোধহয় এই একমাত্র অস্ত্র!...হপ্তাখানেক ধরে ও কলেজে আসছে না। কী আবার নতুন করে ঘটনা ঘটেছে ওদের বাড়িতে! দুর্ঘটনা...অসুখ? তাই যদি হয় : ভয় পাবার কী আছে! মধ্যবিত্তদের চিরসংগী ওটা, এই সহজ সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে পারছে না কেন শিবানী?...নাঃ বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে মেয়েটা!

থমকে দাঁড়ালো। শিবানীদের পুরানো একতলা কোয়ার্টার। বাড়িটা নিস্তব্ধ।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে ডাকলো, 'শিবানী—'

দরজা খুলে গেলো। আলুথালু বেশে, শ্লথ চরণে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। ঘন কালো চুলের রাশি ভেঙে পড়েছে কাঁধের দুধারে, চোখের কিনারায় রাত-জাগা গ্লানি।

শ্যামলী বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুকাল।

'ভেতরে এসো শ্যামলীদি—' মৃদু কণ্ঠে আহ্বান জানালো শিবানী।

'কী হয়েছে শিবানী?'

'ভেতরে এসো—বলছি—'

শিবানী ওকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেলো।

শ্যামলীর চোখে একরাশ জিজ্ঞাসা।

শিবানী ম্লান হাসলো। বললে, 'বাবা মারা গেছেন—কাল রাত্রে—'

'মারা গেছেন!' শ্যামলী চমকে উঠলো।

শিবানী বললে, 'হ্যাঁ। অনেক দিন থেকেই শরীর ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হচ্ছিলো। দিন কয়েক থেকে একেবারে ভেঙে পড়লেন। কাল হার্টফেল করে মারা গেছেন—'

নিস্তব্ধতা।

শ্যামলী নিজেকে সংযত করে নিলো অনেক চেষ্টায়। জিগ্যেস করলো, 'মা কোথায়?'

'ভেতরের ঘরে। ঘুমোচ্ছেন—'

'হুঁ...'

শিবানী এবার কান্নার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো শ্যামলীর বুকে। কাতর কণ্ঠে বললে, 'আমায় কিছু বলবে না শ্যামলীদি! আমি যে আর পারছিনে!'

শ্যামলী সান্ত্বনার সুরে বললে, 'মানুষ মরবেই—তুই আমি একদিন মরবোই—একে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবেই ভাই।'

'কিন্তু আমি এখন কী করবো শ্যামলীদি। কেবল অন্ধকার। সংসারকে রক্ষা করবো কী করে—?'

'সে পরে হবে। এখন থাক। তোরা খেয়েছিস সব?'

'না শ্যামলীদি। ভাইবোনদের খাইয়েছি। আমি আর মা কিছুই খাইনি। খেতে ইচ্ছে করছে না...'

'ছি, শ্যামলী। ছেলেমানুষী করে লাভ নেই। চল দেখি—তোদের কোথায় কী আছে—আমি তোদের খাইয়ে যাবো—'

'তুমি রাঁধবে। না না—'

'কেন? আমি কী কর্মী বলে মেয়ে নই! আমাদের কর্মীও যেমন হতে হবে, মেয়েও হতে হবে তেমনি। বাড়িতে কতোদিন রেঁধেছি আমি। চল আমি তোর দিদি—আমার কথা শুনতে হবে—আয়—'

খাওয়া চুকতে রাত্রি হয়ে গেলো। শিবানী বললে, 'তাইতো। রাত্রি হয়ে গেলো।'

'তুমি ফিরবে কেমন করে শ্যামলীদি—'

শ্যামলী হাসলো। 'দূর! আজকে আমি মোটেই ফিরছি না। তোর পাশে থাকবো শুয়ে—'

'বাড়িতে খবর পাঠাবে না?'

'কী করে পাঠাই! ··আচ্ছা সেজন্যে তোকে মিছিমিছি ভাবতে হবে না। বাড়িতে সবাই চেনে আমাকে। বিনা প্রয়োজনে যে আমি বাইরে কাটাই না কখনো তারা তা জানে।'

অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুজনে অনেক কথাবার্তায় কাটালো। কিন্তু জমাট বাঁধলো না কিছুই। সেতারের ছেঁড়া তারটা কিছুতেই জোড়া লাগছিলো না।

সেদিন অনেক দেরী করে ফিরে এলো বলাই অফিস থেকে। খোশ মেজাজে, মনে ফুর্তির রঙ আর ধরে না ওর।

পদ্ম অবাক হয়ে গেলো স্বামীকে দেখে। আজ এক মাস ধরে লোকটা যন্ত্রের মতো অফিস যাচ্ছিলো, আর দেরী করে ফিরছিলো। চোরের মতো, মুখ কালি করে বাড়ি ফিরতো। গুম মেরে থাকতো সব সময়। পদ্ম কথা বলতে গেলেই খেঁকিয়ে উঠতো কুকুরের মতো। কিন্তু আজ যেন একেবারে পাল্‌টে গেছে মানুষটা। এতো তাড়াতাড়ি লোকগুলো বদলাতেও পারে! কেমন যান্ত্রিক মনে হয় সব কিছু। দম-দেয়া কলের পুতুলের মতো যেন সব মানুষগুলো—যতোক্ষণ চাবি দেয়া থাকে হাসে, খেলে, নাচে, দম ফুরিয়ে গেলে একেবারে অচল! আচ্ছা—কে সেই অদৃশ্য পুরুষটি যে দম-দেয় মানুষকে?

'কই, চা নিয়ে এসো—তাড়াতাড়ি করো। সিনেমা যাবে?' বলাই দিল-দরিয়া হয়ে উঠেছে কিসের আবেগে।

পদ্ম চা নিয়ে এসে সব শুনলো।

'ছাঁটাইয়ের লিস্ট বেরিয়ে গেছে আজ অফিসে। আমি লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছি। যাকগে বাবা বাঁচলাম! কালকেই একটা কালী বাড়িতে পুজো দিয়ে দিও—উস! ছাঁটাই—ছাঁটাই আর ছাঁটাই! রাত্রিতে চিন্তায়

ঘুম হয় না ···আমাদের সেক্শন থেকে দুজন গেছে—কুমুদ আর হরেন্,
আমি শালা রক্ষা পেয়েছি কোনো রকমে।···'

পরদিন।

ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলো বলাই অফিস থেকে। এসেই ধপাস করে জড় পদার্থের মতো আছড়ে পড়লো বিছানায়।

পদ্ম আলনায় কাপড় গোছাতে গোছাতে ফিরে চেয়ে থ মেরে গেলো একেবারে। কালকেই সেই হঠাৎ খোশ মেজাজকে যেমন বিস্ময়ের সংগে গ্রহণ করেছিলো, আজকের এই মুশড়ে-পড়া অবস্থাটাকেও ও একই ভাবে গ্রহণ করলো।

কালকে নতুন করে দম-দেয়া জাপানী দেয়াল ঘড়িটা আবার হঠাৎ বিগড়ে গেলো কী করে!

বলাইয়ের মনে দার্শনিক তত্ত্বের টানাপোড়ন চলে। 'পৃথিবীতে শান্তি নেই'···'সব স্বার্থপর'···'ছোটো লোকের জায়গা'···'ভালোমানুষ আর করে পাবে না'·· এ রকম নানান পরমার্থিক ভাবধারায় কী রকম বিতৃষ্ণ বৈরাগীর ভাব ফুটে ওঠে ওর মনে।

বলাই আর্তনাদ করে পাশ ফেরে।

পদ্ম এগিয়ে আসে, 'অসুখ করেছে নাকি তোমার?'

বলাই জবাব দেয় না। পদ্মর এই ওপর-পড়া কুতুহলে জলে ওঠে মনে মনে। মেয়ে জাতটার ন্যাকামো দেখলে গা-জ্বালা করে!···রান্নাঘর আর শোয়ার ঘরের এলাকার বাইরে পা দেবার বদখেয়াল কেন রে বাপু! বলাইয়ের সব রাগ দুনিয়ার এই নারীজাতের প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় ভরে উঠলো। কী কথা আছে না শাস্ত্রে: 'দিনকা বাঘিনী রাতকা মোহিনী!'··· ঠিক বলেছে মুনি ঋষিরা!···

'মাথাটা টিপে দেবো—?' পদ্ম বলে আন্তরিকতার সংগে।

'চোপ রও—হারাম···' তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আবার ধড়াস করে পড়লো বলাই বিছানায়।

পদ্ম কাঠের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। লজ্জায় রি রি করে উঠেছে ওর মাথা থেকে পা। ছি, ছি, ছি! এই লোকটাকে সমবেদনা জানাতে চায় ও। ছোটালোকের মতো যে গালাগালি করে—কী কুৎসিৎ, নোংরামি! 'বকুল ফুলের' স্বামী কী এর চেয়ে পশু!··

পদ্ম বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বহুদিন কাঁদেনি ও। বাপের বাড়িতে প্রায়ই বালিশে মুখ গুঁজে গুঁজে কাঁদতে হতো। তবে অপমানে নয়, খিদের। যে বাড়িতে মাসের তেরো দিনই চাল বাড়ন্ত—সেখানে কান্না অভ্যেস হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। না—কাঁদবে না পদ্ম!···কিল মারবার গোঁসাই হলেও, ওর স্বামী ভাত দেবার মুরদ রাখে!···

বলাইয়ের চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে অফিসের ঘটনাগুলো।

···টিফিন।

'বলাই বাবু—শুনুন—' ডেস্‌পেচার বর্মন।

বলাই বিড়ি টানতে টানতে এগিয়ে এলো। বর্মনকে ভয় করবার কিছু নেই। বর্মনেরও চাকরীটা এ যাত্রা টিকে গেছে।

'আমাদের অফিস থেকে ষাট জন ছাঁটাই হয়ে গেছে—তিনজন পিওন সমেত, জানেন বোধ হয়··'

বলাই এক মুখ ধোঁয়া গিলে বললে, 'হুঁ···'

'কী করা যায় বলুন?' বর্মন ওর কাছে পরামর্শ চায় যেন।

বলাই কপালে হাত দিলো: 'অদৃষ্ট! এ দুর্দিনে চাকরী যাওয়া মানে··'

'তাহলে বুঝতে পারছেন··'

'পারছি না তাহলে? উফ, ছাঁটাইয়ের আতংকে এ একমাস ঘুম হয়নি আমার···'

'ছাঁটাই কর্মচারীরা আমাদের সহকর্মী—আমাদের বন্ধুও বটে। এক্কাৰ আমরা কিছুই না জানি, কিন্তু জট বাঁধলে পাগলা হাতীও সেই লতাগুচ্ছকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না।···' বর্মন শান্ত গলায় বলে চলে।

বলাই কিন্তু অথৈ জলে পড়েছে। বর্মনের ভাসা ভাসা কথাগুলোর কোনো মানে বুঝতে পারছে না। তবু কেমন শিরশিরানি বোধ করছে রক্তের মধ্যে। বর্মন নিমেষহীন দৃষ্টিতে একভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে। বলাই চোখ নামিয়ে নেয়। কী ফতোয়া জারী করবে বর্মন আংশকায় কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর লোমগুলো।

'ওরা আমাদের দিকে চেয়ে আছে··' বর্মন উপসংহার করলো বক্তব্যের। যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি অর্থগন্ধী।

'এ্যাঁ! ইয়ে—তা—' ঢোঁক গেলে বলাই। বিড়ির মশলাগুলো কেমন তেতো মনে হয়। রামচরণের দোকান থেকে বিড়ি কেনা ছেড়ে দিতেই হবে দেখছি। 'আমরা কী করতে পারি? মানে—'

'আমরাই করতে পারি। ছাঁটাই কর্মচারীদের প্রতিবাদের পেছনে আমাদেরও কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। সহকর্মীদের কাছে তাদের এ অনুরোধ নয়, দাবী!'

ঝনঝন করে মাথা ঘুরে গেলো বলাইয়ের! চোখে সর্ষে ফুল দেখার অবস্থাটা বুঝি এই!

'অর্থাৎ—?' মৃত্যু দলিলের স্বাক্ষর চিহ্ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যেতে চায় ও।

'কাল থেকে আমরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। আশা করি, আমরা সকলেই এতে একমত!'

'ধর্মঘট! স্ট্রাইক!' বলাইয়ের মনে হলো পেছন থেকে ওকে যেন কে ধাক্কা মেরে অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

'হ্যাঁঃ স্ট্রাইক! আজকে যখন জীবনযাত্রা চরম সংকটময় অবস্থার

সম্মুখীন হয়েছে, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর অনশন অক্টোপাশের মতো চার-দিক থেকে আঠালো পা মেলে ধরেছে, ভাবতে পারেন সেই সময়ে এই পাইকারী হারে বেকারীর মানে কী? নিশ্চিত মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়া!...'

'কিন্তু—' মরীয়া হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করে বলাই: 'কিন্তু সরকার কী করে এতো লোককে প্রোভাইড করবে বলুন। দেশ ভাগভাগির পর পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে অনেক টাকা ঘাটতি পড়েছে। তাছাড়া শিশু-রাষ্ট্র...নানা সমস্যা: রিফিউজি, কাশ্মীর সমস্যা...চোরাকারবার...'

'এ ছেঁদো যুক্তিতে আপনি বিশ্বাস করেন? ক্ষমতা বাঁটোয়ারির লোভে নেতারা করলেন দেশ বিভাগ, সৃষ্টি করলেন কাল্পনিক সমস্যা—আর তার পুরো মাশুল দিতে হবে সামান্য বেতনের কর্মচারী আর পিওনদের?...দেশ টুকরো হওয়ার ফলে পাঁচশোর অফিসারদের প্রণামী বেড়ে গেলো হাজারে, পুলিসের বরাদ্দ চড়লো চতুর্গুণে...এ সব হাতী পোষবার খোরাক দিতে হয় কাদের? দেশের গরীব জনসাধারণদের।...আজাদীটা এলো কার—আপনার আমার?' শান্ত নিরীহ বর্মনের চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। 'আর চোরাকারবার—ফাঁসীতে লটকে সবকে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে কী বলেন? গত একমাসে কাপড়ের চোরাকারবার থেকে যা লাভ করেছে মুনাফা শিকারীরা, তাতে করে একটা দুর্ভিক্ষ আটকানো যেতে পারতো!'...

বলাই থুথু ফেলে বললে, 'আচ্ছা ভেবে দেখি—'

বর্মন বললে, 'ভাববার কিছুই নেই। মেজোরিটি ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিয়েছে—আপনাকেও সেই রায় মেনে চলতে হবে—আচ্ছা কথা রইলো, নমস্কার—'

...বিস্বাদে ভরে ওঠে বলাইয়ের মন।

'ভালো মানুষ আর কল্কে পাবে না!'...মানুষের মন ছোটো হয়ে

গেছে—স্বার্থ আর দ্বেষ। ঘোর কলি!···কী যুক্তি ওদের—সেই যে ল্যাজ কাটা শেয়ালের গল্প আছে—ঠিক তাই। ল্যাজ কাটা শেয়ালের সভা বসলো। যেহেতু আমার ল্যাজ কাটা হয়ে গেছে, তাই তোমারও ল্যাজটা কেটে ফেলো!···চাকরী থাকা না থাকা কী আমাদের হাত—কাজ করে যেতে হবে মুখ বুঁজে—তারপর চাকরী টিকলো বা না টিকলো—এলাহি ভরসা!···আমি ধর্মঘট করতে গেলাম কেনরে বাপু—আমি তো তোদের চাকরী খাইনি। কারুর পাকা ধানে মইও দিইনি। 'যে যেমন কর্ম করে ভগবান তাকে সেরূপ ফল দান করেন'—গীতাতেই তো বলেছে সে-কথা!

বলাই জামা গায়ে দিয়ে বেরুবে ঠিক করলো। হ্যাঃ সটান বড়ো বাবুর বাড়ি। জানাবে সবিস্তারে: 'আমি স্যার ঐসব ধর্মঘটের হুজুগের মধ্যে নেই! তবে ওরা জোর করবে—অফিসের গেটে পিকেটিং করবে··· কী করা যায় স্যার—'

বড়োবাবুর কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে হবে। নইলে বড়োবাবু ভাবতে পারে: বলাই লাহিড়ীও ঐ ধর্মঘটের মধ্যে আছে।

বেরিয়ে গেলো বলাই।

শীঘ্রই ঝড় নামবে মনে হয়। আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে।

পাপড়ি হাতঘড়ির পানে চেয়ে দেখলো: এগারোটা। রাত বেড়ে চলেছে।

আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? কমলের একলা ঘরে বসে বসে অধৈর্য হয়ে ওঠে ও। দক্ষিণ থেকে এতোদূরে আজ না এলেই হতো!

কিন্তু···পাপড়ির এনামেল করা মুখের রেখাগুলো কঠোর হয়ে ওঠে।

নাঃ আসুক ঝড়। আসুক—আসুক। দেখতেই হবে ঐ কঠিন আবরণের নিচে কী আছে। অনেক, অজানা, অচেনা, অপরিচিতের কঠিন বরফ স্তূপ ওর প্রখর সূর্যের ঝলকানিতে গলে গেছে। না—ওরা এতো সহজ, এতো ছেলেমানুষ! কী মিলেছে ওদের কাছ থেকে? বনানীর দাদা? শুধু মডেল করে ছবি তুলতেই জানে···মেয়েলী-মেয়েলী ঢঙ··· পায়ের তলে বসে কেবল সুড়সুড়িই দিতে পারে ওরা। টায়ার্ড! নতুন রক্তের আঘ্রান চাই, বলিষ্ঠ পেশীর সংকুচন!

কমলের বৌদি বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। খুব কাজের মেয়ে নিশ্চয়ই।

একখানা বই টেনে নিলো পাপড়ি।

বিছানার পরে গা এলিয়ে দিলো।

বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টির উন্মাদ রাগিনী শুরু হয়েছে।

সংগে বজ্রবিদ্যুতের অর্কেষ্ট্রা।

পাপড়ির বোধ হয় তন্দ্রাই এসেছিলো।

কমল ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো। 'কে?' বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

পাপড়ির আলুলায়িত দেহ—ছন্দের তরঙ্গের মতো বিছানায় মুছিত। রক্ত ফোটা ফর্শা হাত দুটো নৃত্যের ভংগীতে ছড়িয়ে রয়েছে। দু এক টুকরো চুল উড়ছে!

'কে? পাপড়ি—আপনি!' কমল বিস্মিত।

পাপড়ির চোখের ঘনকৃষ্ণ পল্লব দুটো নড়ে উঠলো—চুম্বনগ্রহী কুমারীর অধরের মতো। ঠোঁটের কিনারায় সম্মোহনী হাসি।

পাপড়ি উঠলো না। শুয়েই রইলো।

বললে, 'বড্ড টায়ার্ড। আপনি এসেছেন—'

কমল চেয়ার টেনে বসলো। বললে, 'কী ব্যাপার এই দুর্যোগের রাত্রে সাউথ থেকে।'

পাপড়ি উঠে বসলো। স্খলিত আঁচলটা বুকের ওপর তুলে নিলো। হাসলো। 'এলামই তো। পথে এমন দুর্ঘটনা হবে জানলে···'

'কোথায় এসেছিলেন?'

'এই দিকেই। ভাবলাম আপনার সংগে দেখা করে যাই। তারপর এই বৃষ্টি!' পাপড়ি কমলের বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে হাসলো। পরনের লাল শাড়িটা সারা শরীরে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর। দেহের দুয়ারে ওর আগুনের ইশারা—চোখে আগুনের জয়গান।

কমল মূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। অষ্টম হেনরীর লভ-ফিলসফি কী ভর করে উঠলো ওর দেহে!···এক গ্লাশ জলের থিয়োরী!···

কমল বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো: ঝড় জল সমানে চলেছে।

'রাত বেড়ে চলেছে। বাড়ি যাবেন কী করে?'

পাপড়ি উত্তর করলো না। একটা রাত্রি, নির্জন ঘর, দুর্লভ অবসর। লোকটা কী আর চাইবার কিছু পেলো না? জীবন দীর্ঘ—তার মধ্যে কয়েকটা ক্ষণ—তাকে নিবিড় করে কামনা করতে ক্ষতি কী? একবারও কী দেখতে পাচ্ছে না কমল: সোসাইটির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু—নিজে স্বেচ্ছায় আজ কমলের কাছে ধরা দিতে এসেছে। হ্যাঁঃ ভিখারীর মতো। কমল তো সন্ন্যেসী নয়!···তবে? শ্যামলীর চেয়েও দেখতে ভালো—ওর রূপ যৌবন, কতো নিবিড় রাত্রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো বেসেছে ও।

'কমলবাবু!' পাপড়ির কণ্ঠস্বরে কী আশ্চর্য দীনতা। নার্ভাসের মতো কাঁপছে। রক্তের সাগরে রোমহর্ষণ আরম্ভ হয়েছে ওর, পাপড়ি ঝরে পড়বে বোধ হয় অসহ্য কামনার বাত্যায়।

'উঠুন—' সহসা উঠে দাঁড়ালো কমল।

'কোথায়?'

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি বড়ো রাস্তা পর্যন্ত—'

'এই ঝড় জলের মধ্যে। এতো রাত্রে !'

'হ্যাঁ উঠুন—' কমলের কণ্ঠস্বর যেন দুর্ভেদ্য কঠিন বস্ত্রস্তূপ

পাপড়ি বোকার মতো উঠে দাঁড়ালো।

দিন কাটলো

এক ভীষণ সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, উর্ধ্ব শ্বাসে এক চরম বিস্ফোরকের গর্ভে এগিয়ে চলেছে যুগ।

একটি উপন্যাসের বন্দোবস্তের জবাবে কলেজ স্কোয়ারের বনেদী প্রকাশক দুঃখ করে লম্বা চিঠি লিখলেন। প্রকাশক নিজেই স্বনামধন্য সাহিত্যিক—আজও সংস্করণের সংখ্যা গরিমায় নিজেকে গর্বিত মনে করেন তিনি।

শ্রীকমল লাহিড়ী সমীপেষু,

ভাই কমলবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আপনার পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে আমাদের স্মরণ করেছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের লেখা ছাপাতে পারবো এতো গৌরবের কথা। আমাদের দিন অস্তে গেছে, আপনাদের—নতুনদের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে হবে বৈকি !

পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে থাকলে সুবিধামতো পাঠাবেন। তবে দেখবেন : চাষী মজুরের উগ্র গন্ধ বেশি না থাকলেই ভালো হয়। জানেন

তো : জনসাধারণ আর চাইছে না এসব। আমার প্রগতিশীল নাটকটি তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়ে আর কাটতে চাইছে না মোটেই। বাজার দেখে তো বই ছাড়তে হবে, নাকি বলেন ?

ভালো কথা, পুরনো বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে নিয়ে এপিক উপন্যাস লিখতে শুরু করুন না কেন! এইতো চলছে আজকাল বাজারে!

কবে কলকাতা আসছেন ? নমস্কার।

ভবদীয়—

হাসি পায় কমলের।

বেশিদিনের কথা নয়—একদিন এই লোকটিকে নিয়েই প্রগতিমহলে নাচানাচি পড়ে গিয়েছিলো। তালপন্থী ভদ্রলোকও এই প্রচারকে ক্যাপিটাল করে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, তারপর ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরুলো!…

হাসি পায় কমলের সত্যিই।

চাষী মজুরের উগ্র গন্ধ! ওল্‌ড ফসিল!…

'ঠাকুরপো—আসবো ?' পদ্ম দরজার গোড়া থেকে অনুমতি চাইলো।

'এসো—'কমল আহ্বান জানালো।

'শুনেছো তোমার দাদার আফিসের ব্যাপারটা! নিজেরা তো কাজ করবে না, এমন কি যারা কাজে যাচ্ছে তাদের পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে। উনি অফিস থেকে নটায় ট্রাক আসে তাতে করে অফিসে যান!…আচ্ছা, কী নীচ ওই মানুষগুলো, বলো তো ?'

কমল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দাদা দালালী করছেন!'

'দালালী!' পদ্মর গলায় বিস্ময় ফুটে ওঠে।

'বসো—' কমল বসতে জায়গা দিলো বউদিকে।

পদ্ম বললো বোকার মতো।

'আজ যখন বেশির ভাগ কর্মচারী ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের দাবী-দাওয়া জানিয়ে, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যদি বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজে যোগ দেয়, তাকে কী বলে বৌদি?'

'বারে! তোমার দাদার তো আর চাকরী যায়নি। উনি ধর্মঘট করতে যাবেন কেন?'

'যাঁরা ধর্মঘট করেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকের চাকরী যায়নি তবু তাঁরা ধর্মঘট করে যাচ্ছেন কেন বৌদি?'

'কী জানি বাপু—আমি তা বুঝতে পারি না।' পদ্ম মাথা নাড়লো অসহায়ের মতো।

কমল হাসলো। 'কিন্তু—না বুঝলে তো চলবে না বৌদি। বুঝতে হবেই যে। ধরো, আজ যদি দাদারই চাকরী চলে যেতো, তাহলে···'

পদ্ম রাগ করে! 'কী অলুক্ষণে কথা বলো ঠাকুরপো! ওঁর চাকরী যাবে কেন?'

'আহা, ধরো যদি যেতোই, তাহলে কী হতো? দাদা ধর্মঘটে যোগ দিতেন নিশ্চয়ই! অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময়েই লড়াই করা উচিত, বৌদি। ধর্মঘট কর্মচারীদের ন্যায়ত অধিকার। আঘাতটা আমার ওপর সরাসরি আসেনি বলে আমি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবো! সে-আঘাত তো একদিন আমার ওপরে আসতে পারে! সহমর্মিতা না থাকলে বিচ্ছিন্ন, একক মানুষ সবখানেই হেরে যায়, সর্বস্বান্ত হয়!···'

'ধর্মঘট করলেই বা কী লাভ হবে?'

'লাভ হবে বৈকী! কর্মচারীদের এক জোট প্রতিবাদের হুঁশিয়ারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ মাথা নত করবে। আত্মঘাতী ছাঁটাইয়ের নীতিকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হয়তো সব সময়ে জয় হয় না, তার মানেই এই নয় যে অন্যায়কে আমরা মুখ বুঁজে

বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেবো। আজকের এই পরাজয়কে সুদে-মূলে আদায় করবার দিন আবার আসবেই।'

'বড়ো বড়ো কথা আমি বুঝতে পারিনে। ধরো উনি যদি আজ মাইনে না পান তবে আমরা খাবো কী ?' পদ্মর কণ্ঠে অধৈর্যতা।

'আমিও তো তাই বলছি। খাবার জন্যেই তো কর্মচারীরা ধর্মঘটে নেমেছেন! প্রত্যেকের মনে তোমার মতোই প্রশ্ন : চাকরী চলে গেলে খাব কী! তোমার খিদের অভাবটা যদি সত্যি হতে পারে, ওঁদেরটাই বা মিথ্যে হবে কী করে।'

পদ্ম বোঝবার চেষ্টা করে কথাগুলো।

কমল বলতে থাকে : 'খাবারের তাগিদেই সকলে খাটতে আসে বৌদি। আসন্ন বেকারী জীবনের পাহাড়-প্রমাণ অভাব বিষিয়ে তুলেছে ধর্মঘটীদের জীবনকে। না-খেয়ে মরার চেয়ে, লড়াই করেই মরা ভালো!...শত অভাব সত্বেও ওঁরা যদি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন, তবে দাদা পারবেন না কেন ? কেন উনি দালালী করবেন!'

ঠাকুরপোর কথাগুলো বড় সহজ আর সুবোধ্য! পদ্মর মতো অন্ধও জলের মতো বুঝতে পারে সমস্ত ব্যাপারটা। নিজের অভাবকেই লোকে বড়ো করে দেখে! কেন ওরা ভুলে যায় : সে-অভাব সকলের মধ্যেই। সকলেই খেয়ে পরে বাঁচতে চায়—না-খেয়ে মরতে চায় না কেউ। ঠাকুরপো ঠিকই বলেছে। বুঝতে পারছে পদ্ম রহস্যটা। এর মধ্যে কোনো কুয়াশা নেই, লুকোচুরি নেই। অভাবের সর্বাংগীন চিত্রই এই!...অফিসের বেশির ভাগ লোকই যদি ধর্মঘট করতে পারে, না-খেয়ে যদি লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, তবে ওর স্বামী পারবে না কেন ? নাঃ স্বামীর এই দুর্বলতাকে যেন কিছুতেই ও সম্মানের চোখে দেখতে পারে না। ঠাকুরপোর ভাষায় : এ দালালী, বেইমানি!...তাছাড়া কী! ওর স্বামী বেইমান, দালাল, ইতর! ঘৃণায় বমি বমি করে ওঠে পদ্মর ভেতরটা।

সন্ধ্যে থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দমকে দমকে। পরিষ্কার আকাশ...হঠাৎ কোথা থেকে উঠে আসে মহিষের মতো এক ফালি কালো মেঘ, সমস্ত জলের উচ্ছ্বাস ঢেলে রিক্ত হয়ে আবার উধাও হয়ে যায় অসীম নীলিমায়।

বৃষ্টির উগ্র গন্ধের মধ্যে কোথায় একটা নেশা মেশানো রয়েছে, মাতাল করে দেয় মানুষের মস্তিষ্ককে, ঝিমঝিম কী একটা স্নায়বিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শোণিতে শোণিতে।

বলাইয়ের এ-রাত্রিকে ভারী ভালো লাগে। শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার মতো একটা তীক্ষ্ণ রোমহর্ষণ অনুভব করে শিরায়-শিরায়। পাশে শোয়া একটা নারী-মাংসের উষ্ণ আঘ্রাণ, চর্মে চর্মে উত্তাপের একটা প্রদাহ অনুভব করে দেহের মধ্যে। রক্তগুলো টগবগ করে ওঠে আরবী ঘোড়ার মতো, কুরে কুরে আস্বাদন নেয়া যায় নগ্ন লালসার।

সিগারেট ধরিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে বিছানায় বসে রয়েছে বলাই। হুহু করে হাওয়া কাঁপিয়ে যাচ্ছে ঘরের জিনিসগুলোকে।

ঘরে ঢুকে স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই প্রথমটায় ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো পদ্ম, তারপর কী রকম একটা বিবমিষা ঠেলে উঠলো ওর বুকের ভেতর থেকে। ভয়ংকর আত্মতৃপ্তি আর প্রচণ্ড এষণার পৈশাচিক ছাপ ফুটে উঠেছে লোকটার চোখে মুখে। মানুষ কী অবস্থা বিশেষে পশু!...মনের কুৎসিৎ কামনার প্রতিচ্ছবি কী উলংগ ভাবে রেখাংকিত হয়ে ওঠে বহির্লোকে!

'এসো—এতো দেরী!' বলাইয়ের কণ্ঠ যেন গলে গলে পড়ছে ধৈর্যহীন কাঠিন্যে।

পদ্ম পায়ে পায়ে এসে বসলো বিছানায়। সম্মোহনীর মতো।

বলাই একমুহূর্ত সময় বাজে খরচ করতে চায় না। টাইম ইজ মনি! কালকে নটায় তো একটু হলে মাথাটা গিয়েছিলো আর কী! ট্রাক থেকে

নামতে যাবে এমন সময় সাঁই করে একটা পাথরের টুকরো, ভাগ্যিস ঘুরে পড়েছিলো তাই রক্ষা! উফ—চাকরী করা নয়তো যেন প্রাণটাকে হাতে করে চলা!···ইদিকে—অফিসে কাজ হচ্ছে তো ছাই! জন তিরিশেক আমরা মাত্র অফিসে যাচ্ছি। কোনো রকমে হেড অফিসের সংগে সংযোগ রক্ষা করে চলা···বড়োবাবু মুহুর্মুহু বিড়ি ধরাচ্ছেন আর হম্বিতম্বি কর্মচারীদের ওপর। একশো হাতে তিনটে ডেস্কের কাজ করা। দূর ছাই! আর ভেবে লাভ নেই এসব।

পদ্ম হাঁশপাঁশ করছে। এতোদিনকার সহবাসে লোকটাকে চিনেছে ও। নিজের প্রয়োজনের বেলায় কোন হেলা-খেলা নেই ওর। প্রতিবাদ করলে, বাধা দিতে গেলে জেদ্ আরো বেশি পেয়ে বসে। সে-আক্রমণকে সহ্য করা পদ্মর অসাধ্য। তাই—যা হবার যতো শীঘ্র হয়ে যায় সেই ভালো। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে ও। অদ্ভুত এই জীবন! যাকে ভালোবাসি না, যাকে ঘৃণা করি কুকুরের মতো, তাকেও, হাড়িকাঠে ছাগলের মাথা-পাতার মতো, দেহ ভোগ করতে দিতে হবে।

ওদের গাঁয়ের সুখি বোষ্টমীর কথা মনে পড়ে যায় কেন হঠাৎ! খুব বদনাম ছিলো ওর। সে-নাকি কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে ওর দেহকে পুরুষের সামনে তুলে ধরতো। ওর স্বামী ছিলো না। আজকের এই ঘন রাত্রে কেমন বিশ্রী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে পদ্মর মনেঃ ওর সংগে সুখি বোষ্টমীর যেন কোনো পার্থক্য নেই!

শোষক রাত্রি পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলে।

বলাই পাশ ফিরে শোয়।

পদ্মর চোখে ঘুম আসে না। হঠাৎ একটা ভুল করে বসে ও।

'ওগো—শুনছো—' পদ্মর গলা স্যাঁতসেঁতে শোনায় আবেগে।

'উঁ···' বলাই কষ্ট করে জানায় যে সে শুনছে।

'আমার কথা রাখো—কাল থেকে তুমি আর অফিসে যেও না!'

'তার মানে ?' সটান ঘুরে জিগ্যেস করলো বলাই।

'আর সবাই যখন কাজে যাচ্ছেনা তখন···'

'কে একথা শিখিয়েছেন ? নিশ্চয় কমল !' খিঁচিয়ে উঠলো বলাই : 'যেমন গুরু তেমনি চেলা ! বটে ! আমি চাকরী না করলে ধর্মের ষাঁড়ের মতো ওই বলদটার দুবেলা গেলা চলবে কী করে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো চলবে কী করে !···হুম—ঠাকুরপোর সংগে এই বদ পরামর্শই চলে বুঝি। খবরদার, আর কোনোদিন শুনিনা যেন। সাবধান—' বলাই ফোঁশ ফোঁশ করতে করতে পাশ ফিরে শোয়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত পদ্মর ঘুম নামে না।

স্বামী ঘুমোলে পর ও মেজেয় মাদুর পেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

আবার বৃষ্টি নেমেছে ঝিপ ঝিপ করে।

কমল লিখতে লিখতে সোজা হয়ে বসে।

দোরে আঙুলের আওয়াজ পড়ে।

কমল উঠে দরজা খুলতেই কালো ছায়ার মতো একটা লোক ঘরে ঢুকে পড়লো। গায়ে ছেঁড়া হাফসার্ট, হাঁটুতে তোলা কাপড়, খালি পা। একমুখ রুক্ষ দাড়ির মধ্য থেকেও চোখা চোখ দুটোকে চেনা যায়।

'সিদ্দিক !'

'কমরেড—' সিদ্দিকের চোখ দুটো শিশুর মতো হাসতে থাকে।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে প্রচুর তোড়জোড় করে। একটানা বর্ষণের ছন্দ।

'রাতের মতো শেল্‌টার দিতে হবে কমরেড—'

কমলের মনে নানা রংএর কুতুহল উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। অনেক জিজ্ঞাসা আর প্রশ্ন। কমরেড সিদ্দিক ওর গল্পের নায়ক। গল্পটা আজ রাত্রেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু পরিণতি ঠিক মেলাতে পারছিলো

না। শেষের দিকটা বড়ো কাল্পনিক তাই রোমান্টিক-আলেয়া হয়ে উঠছিলো। কমরেড সিদ্দিক। ফেরারী ফৌজ। হুলিয়া বেরিয়েছে [illegible] নামে। ডাকাতি, লুঠ, দাংগা—অনেকগুলো কেসের শেকল। কমরেড সিদ্দিক ডাকাত? To-day's bandits are the patriots of to-morrow!...ইতিহাস স্থাবর নয়, জংগম।

সিদ্দিকের জামা কাপড় সব ভিজে গেছে। রুক্ষ চুল দাড়ি ভিজে লেপটে গেছে।

কমল একটা কাপড় এনে দিলো, জামাও একটা যোগাড় হলো।

সিদ্দিক হাসলো পিট পিট করে। ডাকাতের চোখে হাসি!

'এ কী কমরেড!' সিদ্দিকের গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলো কমল। গা পুড়ে যাচ্ছে ওর, ভীষণ জ্বর, চোখে ওর ওটা হাসি নয়, হাসির প্রেত।

'জ্বর হচ্ছে কদিন থেকে। খেতে পাচ্ছি না·· কোনোদিন মুড়ি, কোনো দিন ছাতু—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে খাওয়ার। বাড়িতে সি. আই. ডি বসে—একদিন রাত্রে লুকিয়ে বাড়ি ঢুকতে ধরা পড়ি আর কী! কোনো রকমে পালিয়ে যাই। মহাদেবের ওখানে ছিলাম কিছুদিন—আর ইচ্ছে করলো না। ওর বউ নিজে না খেয়েও জোর করে খাওয়াবে আমাকে। বড্ড লজ্জা করে। পালিয়ে এসেছি। জ্বর গায়ে লেগেই আছে। বিকেলের দিকেই চোখ জ্বালা করে জ্বর আসে···' সিদ্দিক বলে আর হাসে।

ডাকাত সিদ্দিক সেথ খেতে পায় না! 'ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছো, ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছো বিপজ্জনক!'

কমল জামাটা গায়ে চড়িয়ে দিলো।

'একটু বসো—আসছি—'

কমল দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

মোড়ের মাথায় সিনেমা হল। চায়ের স্টল, রেস্তোরাঁ। পকেটে এক টাকার নোটের পুঁজি।

রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে।   কিছু পাওয়া যাবে না।

চায়ের স্টল থেকে এক গেলাস দুধ আর পাঁউরুটি নিয়ে ফিরলো ও।

খাওয়া দাওয়ার পর অনেক গল্প হলো সিদ্দিকের সংগে। জ্বরে হাঁস-ফাঁশ করছে ও। কমল সারা রাত্তির বসে শুশ্রূষা করলো অপটুর হাতে। গভীর রাত্রে দুজনে বেরুলো। সিদ্দিকের শেল্‌টারের ব্যবস্থা হলো বন্ধু চিরঞ্জীবের ওখানে এক রাত্তিরের জন্যে। ও ভয় পাচ্ছে।

ভোর বেলায় বাড়ি ফিরলো কমল।

কলেজের ছুটির পর বেরিয়ে এলো ওরা। শ্যামলী আর পাপ'ডি।

শ্যামলী হেসে জিগ্যেস কবলো, 'উঃ দীর্ঘ বিবতিব পরে তোর সংগে দেখা। কলেজেও আসতিস না। কোথায় ডুব মেবেছিলি?'

পাপড়ির গলা বিষণ্ণ শোনায়ঃ 'কোন্ সাগবে আর ডুব দিই বল .'

'মানে?'

'মানে—water water everywhere no water to drink!'

শ্যামলী হেসে উঠলো হি হি করে। পাপড়ি কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। কেমন অন্যমনস্কের মতো নিজের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে ও।

শ্যামলী বিস্মিত হয়! পাপড়ি খুব চিন্তা করছে—এই ভাবটাকে বিশ্বাস করে ওঠা শক্ত। কারণ ওর রঙীন প্রজাপতিপনা জীবনে ভাববার অবকাশ খুব কমই আছে! জিগ্যেস করলো, 'ব্যাপার কী! পাপড়ি দে'র ছন্দঃপতন! কী ভাবছিস অতো?'

'নাথিং!' রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে উত্তর করলো পাপড়ি।

'তবে—?'

'আঃ তুই বড্ড কিউরিয়াস!'

'তারি জন্যে তো শুনতে চাইছি—'

'কিন্তু অরসিকেষু···জানিস তো? 'Strange fits of passion have I known and I will dare to tell but into the lover's ears alone—সুতরাং···' কাঁধ ঝাঁকালো পাপড়ি।

'ও! তাহলে তো আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য। যাকে বলে: নীরস গদ্য—চল, আমাদের বাড়িতে যাবি?'

'না ভাই আজ না—' পাশ কাটিয়ে যেতে সহসা থেমে পড়ে' বেমক্কা দার্শনিকের ভংগীতে বলে উঠলো পাপড়ি: 'মানুষের ক্ষুধা আছে জানিস শ্যামলী?'

বিস্ময় ছড়ানো চোখে শ্যামলী বললে, 'তারপর··?'

'তোরা কেবল মানুষের একটা ক্ষুধার দিকেই নজর দিয়েছিস। কিন্তু দেহের ক্ষুধা ছাড়াও আরো একটা ক্ষুধা রয়েছে। সেটা মনের।'

শ্যামলী বললে, 'আমরা তো সেকথায় আপত্তি করিনি—'

পাপড়ি বললে, 'কথায় স্বীকার করলেও কাজে কোনো দাম দিসনে তোরা।'

'আজ যেখানে দেহের ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে মানুষ পাগলের মতো আকাশ পাতাল খুঁজছে, সেখানে অপর ক্ষুধার কোনো দাম বর্তমানে থাকতে পারে না।'

'But men cannot live by bread alone শ্যামলী—'

'জানি। কিন্তু রুটি অধিকারের ইতিহাসই প্রথম কথা। রুটির যুদ্ধের পরে অন্য কিছু।'

'হুঁ···তোদের যুক্তি আমি জানি। নিপীড়িত বঞ্চিত জনসাধারণ—তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'হুঁ...কিন্তু আরো যে কতো অগণন জনসাধারণ এমনি করে মনের আগুণে জ্বলে মরছে তার খবর কী রাখিস?'

'থাকি বৈকি। এইসব কারণের মূলে রয়েছে এক সত্য। বর্তমান সামাজিক কাঠামো। একে ভাঙতে হবে। নইলে—'

'বিপ্লবের কথা রাখ। ও এক বাঁধা বুলি। আমি যা বলতে চাইছি—'

'বল ?'

'আমি মরতে বসেছি। আমি বাঁচতে চাই—'পাপড়ির কণ্ঠে কান্নার রোল শোনা গেলো।

শ্যামলী হাসলো। 'তোদের ওই রোগের হাত থেকে বাঁচাবার মন্তর তো জানিনে ভাই। ডাক্তারকে দেখা না—'

পাপড়ি বললে, 'ডাক্তার সব অসুখ সারাতে পারে না। আমি—কী করে যে বোঝাই তোকে · অনেক কথাই বলবার ছিলো—আচ্ছা আজ থাক চলি—'

পেছনে রহস্যের ধোঁয়া ছড়িয়ে শ্যামলীর বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে ত্বরিতে পা চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো পাপড়ি।

শ্যামলী ফুটপাত বেয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো।

মোড়ের মাথায় থমকে দাঁড়ালো ও।

'আরে শিবানী !'

'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম শ্যামলীদি—' শিবানী হাসলো।

'আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমি যে ভাবতে পারছিনে ভাই। তুই ইস্কুল ছেড়ে দিবি !' শ্যামলীর কণ্ঠে বেদনা।

শিবানী হাসলো। ক্লিষ্ট হাসি। বললে, 'উপায় কী বলো শ্যামলীদি ! তুমিতো আমাদের সংসারের অবস্থা জানো। ছোটো ছোটো ভাই বোন বিধবা মা—সকলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে যে ! ওদের মুখে খাবার না তুলে দিয়ে কী করে বই নিয়ে বসি' বলো !'

শ্যামলী নিশ্বাস ফেললো।

শিবানী হাসলো ফের। 'দুঃখ করে লাভ নেই শ্যামলীদি। পড়াশুনো

তো আর সবারি হয় না।…আর তাছাড়া পড়াশুনো করেই বা কী হবে…
নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেয় ও। 'কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছিনে। ম্যাট্রিক না পাশ করলে চাকরীর কোনো আশাই দেখছিনে…'

শ্যামলী একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা—আমরা যদি ইস্কুলে ফ্রির ব্যবস্থা করতে পারি। তাহলে… ?' কাঠবেরালীর মতো সমুদ্রে বাঁধ বাঁধতে চায় ও।

শিবানী বললে, 'না না তা হয়না শ্যামলীদি। টাকা চাই। টাকা—টাকা—টাকা—সংসারকে বাঁচাতে হবে!'

শ্যামলী আর কথা বলতে পারে না।

শিবানী বললে, 'একটা উপায় ঠিক করেছি। আমাদের পাশের বাড়ির মিঃ বসু—ওঁর এক বন্ধু সিনেমাব প্রডিউসার—সেখানে একটা সুবিধে করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বেশ ভদ্রলোক! তবে'…একটু থেমে কাঁধ ঝেড়ে আবার বললে ও: 'ওঁর পুরস্কারের ইংগিতটা বড়ো বস্তুতান্ত্রিক।'

'অর্থাৎ ?' শ্যামলীর শংকা-কুল চোখের ভাষা।

পাথরের মতো শক্ত শিবানীর মুখ! 'একটা রাত্তির আমাকে চায়!'

শ্যামলী স্টাচুর মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথের ওপর।

শিবানীই ওকে পথ-চলতে সাহায্য করলো: 'অবাক হচ্ছো শ্যামলীদি। এই জীবন!'

জীবনকে যেন এই কদিনে বড়ো বেশি চিনেছে ও! শ্যামলীর মাথাটা আশ্চর্য হালকা আর নিরেট হয়ে গেছে। দিস ইস লাইফ! বাঁচতে হবে—যে কোনো খেসারতে। লভ অব লাইফ…?

শ্যামলীদের বাড়ি।

তুজনে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো।

বিছানাব ওপর দিব্যি আরাম করে পড়ে নাক ডাকিয়ে চলেছে কমল।

দিগভ্রষ্ট জাহাজের নাবিক অকুল দরিয়ায় লাইট হাউসের সন্ধান পেলো যেন।

'কমল—কমল—ঘুমোয় না অতো—ওঠো—'

ধাক্কাধাক্কিতে ঘুমের আমেজ কেটে গেলো কমলের। চোখ রগড়ে উঠে পড়লো ও।

'এই যে তোমরা তুজনেই—বসো—'

শ্যামলী বললে, 'পড়ে পড়ে এই অবেলায় ঘুমোচ্ছিলে কেন কুঁড়ের মতো?'

কমল হাসলো। ওকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখালো।' রাত্তিরে ঘুম হয়নি···।'

'কেন?'

'উঃ—ভ্যাট এটার্নাল হোয়াই! শরীর ম্যাজম্যাজ করছে—চা নিয়ে এসো—'

শ্যামলী হাসতে হাসতে চলে গেলো।

নত হয়ে বসেছিলো শিবানী। সংসারের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওর মন। ঝিমিয়ে পড়েছে স্নায়ুকেন্দ্র। 'মিঃ বসু আমাকে এক রাত্তির চায়!' শিবানী সেনেব সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত, জীবনীগঠনের নির্ভুল স্তরগুলোর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মিঃ বসু। সিনেমার স্টার শিবানী সেন! নাম খ্যাতি যশ ইত্যাদি যতোগুলো প্রসপেক্টের কথা রয়েছে তার সংগে অর্থ! অজস্র, অপার!···পেছনে টানছে মরালিটি, ইস্কুলে গুড ক্যারেক্টারের ছাপ! সিনেমায় ঢুকে চরিত্রহীন হবে 'একদা এক ভালো মেয়ে'! চরিত্র? সেটা কী বস্তু! আর যায় যাক না সেই অমুল্য চরিত্রটি। উজ্জ্বল ভবিষ্যত···স্টারের জনপ্রিয়তা···অর্থ!···না: মিঃ বসুকে এক রাত্তির চরিত্রহীন করতে দিলে বিশেষ লোকসান নেই ওর। আগামী

দিনের অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে ওই এক টুকরো রাত্রির চরিত্রহীনতা অস্পষ্ট হয়ে যাবে !···বাঁচতে হবে !

'শিবানী—' কমল ডাকলো এক সময় ।

'হ্যাঁ !' অন্যমনস্কের মতো জবাব দিলো ও। ঘামে নেয়ে যাচ্ছে ওর কপাল, সোনালী লোমকূপে ছাওয়া হাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'শিবানী—আমি শ্যামলীর কাছে সব শুনেছি—'

শিবানীর জামার হাতা ঘামছে, কপাল চুঁয়ে উত্তেজনাগুলো যেন জল হয়ে গলে গলে পড়ছে।

'তোমার সামনে আজ যে সমস্যা তা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমষ্টিগত। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যাকেই সমাধান করতে পারবে না। শ্রেণীগত ভাবে মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারে না—ইতিহাস তাই বলে।'

শিবানী আস্তে বললে, 'আমিও তাই বিশ্বাস করি দাদা ! কিন্তু···তবু তো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়—জীবনযুদ্ধ···'

শ্যামলী চা নিয়ে এলো।

ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলো কমল। শ্যামলীকে যেন আজ করুণ দেখাচ্ছে। ওর চোখের পাতা ভিজে-ভিজে···কেঁদেছে নাকি ও। কেন ?

সোনালী রংএর চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে। এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে কমল। সমস্যা !···বৌদি···শিবানী···কমরেড সিদ্দিক··· সমাধান ? পরিবর্তন চাই !

'একী ! চা খাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !' শ্যামলী জানান দিয়ে উঠলো।

'আঃ কী ভাবছো চা খাও—' শ্যামলী এবার রেগে ওঠে দস্তুর মতো।

কমল চায়ের কাপটা টেনে নিলো।

'Time present is a cataract
whose force
Breaks down the bank, even
At its source,
History forming in our hands,
Not plasticene but roaring sands
Yet we must swing it to its
final cource !'

শিবানী উঠে দাঁড়ালো।

'আজ চলি শ্যামলীদি—একটু কাজ আছে'—যন্ত্রের মতো বেরিয়ে গেলো ও।

কমল এবার যেন বাস্তবে ফিরে এলো।

'শিবানী চলে গেছে !'

'হ্যাঁ—' ধরা গলায় বললে শ্যামলী।

'এদিকে শোনো—তুমি কাঁদছো ! কী হয়েছে ?' কমল সাশ্চর্যে জানতে চাইলো ব্যাপারটা।

শ্যামলী বললে সব কিছু। 'শিবানীকে আমরা হারালাম।' ইস্কুলের সবচেয়ে ভালো আর কাজের মেয়েটি ! শিবানী সেন—জীবনকে বিকিয়ে দেবে, আত্মহত্যা করবে ও সংসারের হাঁড়িকাঠে। এই স্বার্থবাহী দোকানদারি সমাজ-বিন্যাস—মেয়েদের এখানে কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই, বাজারের পণ্যের মতোই তাদের জীবনের দাম। রুপোর চাকতির বিনিময়ে মেয়ে-মাংস কিনতে পারা যায় : এতোই সস্তা এখানে মেয়েমানুষ !...পুরুষ ও নারী—সম্বন্ধ শুধু শোষক আর শোষিতার, প্রভু আর ক্রীতদাসীর। এদেশের বাপের সুসন্তানেরা ওঁদের জন্যে মেয়ে বিয়ে করে দাসী কিনে আনেন, যে একাধারে দিনের বেলার ঝি, রাত্তিরে বিছানার লীলাসংগী।

শৈশব যৌবন বার্ধক্য পর্যন্ত—মেয়েদের জীবন খোঁটায়-বাঁধা গৃহপালিত মূক পশুর মতো। কিন্তু ভণ্ডামি আর চলবে না! এ পুরুষশাসিত অসভ্য বর্বর সমাজসম্বন্ধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলবো আমরা। আগামী নতুন সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক হবে: বন্ধুত্বের, সহমর্মিতার ও সহকর্মিতার!

কমলের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। পশু আর ইন্দ্রিয়লালসায় কুৎসিৎ সরীসৃপ মিঃ বসুর মুখটা যেন এক ঘুষিতে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলো ওর। ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করলো ওর জিভকে—যা হীন প্রস্তাব উচ্চারণ করেছে একটি অসহায় মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে! কিন্তু কটা মিঃ বসুকে মারবে ও! সমাজের মাথায়—টাকার শক্তিতে—ওপর থেকে নিচ এই সব যৌন গন্ধ শোঁকা কুকুরের দল।

লড়াইয়ে সৈনিক মরবেই উপায় নেই!

গলির মোড়ে পড়তেই চার চোখ!

উড়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা! জোরে জোরে বিড়ি ফুঁকছে। ঘুনে-ধরা বাঁশের মতো হেলে পড়া শরীর, রোদে গ্রীষ্মে আর বসন্তের ঘায়ের দাগে বাসি শবের মতো মুখ, অসুস্থ ট্যাঁরা চোখ। ছোটছেলেদের শেলেটে-আঁকা ভূতের মত আকৃতি।

কার্তিক আই-বি! হাসলো কমল। কয়েকদিন থেকে লোকটা পিছু নিয়েছে, গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে। কমলকে দেখে টিকটিকিটা স্বেচ্ছাকৃত ব্যস্ত ভাব দেখালো, তাড়াতাড়ি দোকানীর কাছে পানের ফরমাশ দিলো। আড়চোখে কিন্তু নজর আছে রাস্তার ওপর—যেখান দিয়ে কমল চলেছে দ্রুত পায়ে।

কে ডাকলো চাপা আওয়াজে?

ফুটপাথের ওপর থেকে কে ইশারায় ডাকলো। কমল এগিয়ে গেলো।

'ইসমাইল!'

'হ্যাঁ—সিদ্দিক আপনার সংগে দেখা করতে চায়—'

'কোথায় ও?' কয়েকদিন থেকে ও একেবারে নিখোঁজ। চিরঞ্জীবের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলো পরদিন। চলে গেছে!

'আমার সংগে চলুন—'

ইসমাইল আগে আগে চলতে লাগলো। কমল ওকে অনুসরণ করে চললো পেছনে।

এগলি সে-গলি, অনেক বাঁকা চোরা পথ। শহরের উত্তরাঞ্চল—কল কারখানা শিল্পকেন্দ্র। দক্ষিণের সংগে এখানকার চেহারা একেবারে উল্টো। লন ঢালা ড্রয়িংরুম আর গাড়িবারান্দার বাহুল্য নেই এখানে, আকাশে উঁচু উঁচু ফ্যাক্টরির চিমনি···অনর্গল ধোঁয়া উড়ছে, আকাশ কালো আর ধোঁয়াটে। মেহনতী মানুষ—কলকারখানার মজুরদের এলাকা।

অন্ধকার সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো দুজনে। কাঁচা নর্দমায় উপচীয়মান ময়লার উগ্র গন্ধ, এখানে সেখানে খানা খন্দরের পচা জলের বিশ্রী আস্বাদ। পীড়িত পরিমণ্ডলী। খোলার ঘর, সারি সারি, অপরিসর পথ, পাশাপাশি দুজনে কোনোক্রমে হেঁটে যাওয়া যায়।

'থামুন—' ইসমাইল থামিয়ে দিলো।

আধা অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা। মেজেয় কম্বলের 'পরে পড়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে কে ও? সিদ্দিক! কমরেড সিদ্দিক—জংগী নেতা সিদ্দিক!

'সিদ্দিক—'

'কমলভাই!' সিদ্দিকের মুখে সেই শিশুর মতো হাসি। কিন্তু সে-হাসিতে যেন প্রাণ নেই, রুগ্ন ফ্যাকাশে।

এ কী চেহারা হয়েছে ওর! ইস্পাতের মতো মজবুত শরীর,

চীনের প্রাচীরের মতো দৃঢ় গাঁথনি—কি করে ক্ষয়ে যেতে পারলো ওর দেহ! কী হয়েছে ওর? চীনের প্রাচীরে কী ধ্বংসের ক্ষয় কীটেরা বাসা নিয়েছে, কুরে কুরে খাবে, তিল তিল করে হাড় পাঁজরা বের করে ফেলবে শক্ত গাঁথনিটার—?

'কী হয়েছে তোমার কমরেড?'

সিদ্দিক কী তবু হাসবে! কিন্তু কমলের যে কান্না পাচ্ছে! হ্যাঃ সাময়িক দুর্বলতা! সিদ্দিক জানালোঃ 'খুন বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। আজো—'

খুন! রক্ত! সিদ্দিকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। নিশ্চিত স্বাক্ষরিত মৃত্যু দলিল। যক্ষা! যক্ষা কেন হয়? কমরেড, তুমি মরবে! তোমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেছে! বিরাট অভাবের দুনিয়া থেকে নিঃশেষে তুমি খশে পড়বে!

না না তোমায় বাঁচতে হবে কমরেড—আমাদের ঘরের ভাঙা কপাটে ঝড়ের ধাক্কা এসে লেগেছে···সমস্ত দিকপ্রান্ত জুড়ে ঝড়ের গর্জন··· উদ্বেলিত জনতার বন্যা···প্রচণ্ড ধ্বংসের চেহারা নিয়ে ছুটে আসছে। তোমায় বাঁচাতে হবে কমরেড।···শত্রুরা তোমায় খুন করেছে। ডাকাত—তুমি ডাকাত কেন? তুমি বাঁচতে চেয়েছো—কিন্তু তাতে যে মৃত্যু ওদের! ওরা আমরা একসংগে বাঁচবো কী করে বলো? তাইত ওরা আজ আমাদের খুন করেছে ওদের বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু শত তাজা খুনের মধ্যে দিয়েও আমাদের মৃত্যু নেই। ওদের মৃত্যুকে পুরনো কাহিনীতে পরিণত না করা পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই, আমরা থামবো না কিছুতেই। লক্ষ লক্ষ বন্দী সাধনা করছে দেশে দেশে, ক্রীতদাসের মায়ের অশ্রু এঁকেছে সেই ভবিষ্যত পটভূমি, শহীদের তাজা লাল রক্ত চিহ্নিত করেছে আসন্নযুগের রেখাচিত্র, লক্ষ লক্ষ মজুরের হাতুড়ি বিচ্ছুরিত আগুনের ফুলকি···হাজার কাস্তের উন্মুখ শপথ—সেই বিপুল আর প্রবল

আগামী তুলছে আমাদের রক্তে, ধ্বনিত হচ্ছে কণ্ঠে, প্রকাশিত হচ্ছে কর্মে।

কমরেড—তোমাকে যারা খুন করেছে, তোমার-আমার সেই অভিন্ন শত্রুকে আমরা খুন করবো নির্মম হস্তে। আগামী দিনের ফাঁসীর মঞ্চ আজ শুধু অপেক্ষা করছে দুশমনদের জন্যে।

চিকিৎসে! টাকা! পরিস্থিতি!...চিকিৎসের টাকা। এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি—টাকা কোথায়? ধনীদের হাসপাতাল, ধনীদের ডাক্তার—কায়েমীস্বার্থের শত্রুকে কেন জীবন দেবে ওরা? ওরা তো তাই চায়! কমরেড সিদ্দিক ফেরারী আসামী—অন্ধকারে কীটেরা ওঁৎ পেতে আছে...সুযোগ পেলেই কারা প্রাচীরের অন্ধকারে চিপে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে ওকে!

কী করে বাঁচাবো তোমাকে কমরেড!

'ধরা দেবো!' আস্তে ওর সিদ্ধান্ত জানালো সিদ্দিক!

'ধরা দেবে! সারেণ্ডার করবে!' কমল চমকে উঠলো অকারণেই।

'উপায় কী! জেলে চিকিৎসে হবে তো। তাও তো বাঁচবো কয়েক দিন...'

'না কমরেড—শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ নয়। আমি ব্যবস্থা করছি—'

কমল বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

ব্যবস্থা! কী ব্যবস্থা করবে ও! মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে কমলের। তবু...চেষ্টা! স্থানীয় হাসপাতালে টি. বি.-র বেড নেই। এর মানে এই নয় যে এখানে যক্ষ্মা হয় না। এক্সরে-রও কোনো বন্দোবস্ত নেই। একবার এক্সরে প্লেট নেয়া দরকার। কলকাতা। টাকা—? তাছাড়া ফেরারী রুগ্ন রোগী আসামীকে কী ভাবে গোপনে চালান করবে অতো দূরে!

তবে আত্মসমর্পণ ছাড়া কী ওর কোনো উপায় নেই। একজন লোক মরে যাবে চোখের সামনে। কিছু করতে পারা যাবে না!

তবু···সময় কাটে।

মহানন্দার বুকে যৌবন নেমেছে। ক্ষীণ-কটি কৃশ নদীটি আকুল প্রাণ-বন্যায় উছলে উঠেছে। বর্ষার ঘোলাটে জল···শাদা শাদা ফেনা···গেরুয়া বাদাম-তোলা ব্যাপারীদের ঢাকাই নৌকো···স্রোতের তোড়ে ভেসে যাওয়া জেলে ডিঙী—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত আয়োজনে মেতে উঠেছে পাহাড়ী নদী।

মহানন্দা বয়ে চলে আপন বেগে।

কানা খবর হাওয়ায় হাওয়ায় ছোটে!

কমলের কানের পর্দায় এসে যথারীতি আঘাত করলো খবরটা! নিশ্চিত মৃত্যু-গোনা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বন্ধুর সঠিক মৃত্যু শুনে একদিন যেমন ঘা খেয়ে ওঠে মনটা! কবি চিরঞ্জীব—বিপ্লবী কবিতার লেখক চিরঞ্জীব! 'যা হবার হয়ে যাক এখুনি!' 'Now or never!'···বহুদিন ধরে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছিলো ওর দুর্বল মনে। কীটগুলো আজ কুরে কুরে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওর মনের ফুসফুস! রঙ্গমঞ্চে বাঘের গর্জন তুলে আবির্ভাব করে পরিণামে শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পলায়ন!···অসুস্থ বিকৃত নিধিরাম সর্দার অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছে; জীবন থেকে বিদায়!···

না—কবি তোমার অধ্যায়কে আমার জীবন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে। যারা আমাদের বিপক্ষে তারা আমাদের কেউ নয়—তারা আমাদের শত্রু! তোমার 'পরে আর কোনো অনুকম্পা নেই। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে কোনো তৃতীয় শিবির নেই—তুমি বিশ্বাসঘাতক।

বাস্তব সংগ্রাম থেকে সরে গিয়ে তুমি শত্রু পক্ষের শিবিরের সংগে আপোস করেছো! শ্রেণী-সমন্বয়! আজ যেখানে মাঠে-ময়দানে আপোস-বিহীন নির্মম জনতা দ্বিধাহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—জানো: কমরেড সিদ্দিক সে-লড়াইয়ে খুন হয়েছে! সেখানে সস্তা নভেলের জলো নায়কের

মতো রাজকুমারীর কালো চুলের বন্যায় উটপাখীর মতো বাস্তব থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছো তুমি !…জানো কী ঃ তোমার প্রেমিকার সেই নীলাম্বরী শাড়ি আর মুক্তোর গয়না, ওডিকলোন আর কিউটিকুরার উত্তেজক রসায়ন-এর আড়ালে কার রক্ত লেগে রয়েছে ? সে কমরেড সিদ্দিকের মতো শত শত মেহনতী কারখানার মজুরদের !…

কবি, জীবনে ফাঁকি দেবার যো নেই ! জীবন তোমাকে ক্ষমা করবে না কোনোদিন।

নির্মম ছুরির মতো ঝলসে উঠেছে খবরটা !

কবি চিরঞ্জীব আজ লেডি চ্যাটার্লীর নায়ক। মধ্যবিত্ত রুগ্ন কবি প্রেম করছে নীল রক্ত আভিজাত্যের সাথে। পাপড়ি দে !

পাপড়ি দে। এটর্নী দে-র তুলালী মেয়ে। 'লেডি চ্যাটার্লীজ লাভার' ও সত্যিই ডজনখানেক বার পড়েছে। আজ বিশ্বাস হয় কমলের।

প্রেম ? 'Abstract ecstacy'…'Love is heaven'…? 'A book of verse, a flask of wine and thou !' ওমরখৈয়ামী ইউটোপিয়া !…

বিকৃত নিউরসিসগ্রস্ত চিরঞ্জীব আর যৌনগন্ধ-বিতরণ-পটিয়সী পাপড়ি দে ! প্রেম ?

'তবে কী প্রেম বে-আইনী ?' সেদিন কোন্ এক বন্ধু মন্তব্য করে উঠেছিলো।

কমল উত্তরে হেসে বলেছিলো ঃ 'যুদ্ধের সময়ে লড়াইয়ের ট্রেঞ্চে প্রেম-সংগীত গাইবার কোনো অবকাশ নেই বন্ধু ! শত্রু আক্রমণ করতে এলে একমাত্র উন্মাদ ক্লীবই বসে বসে অর্গানের রিডে ঝড় তুলতে পারে—'

বন্ধু থামেনি। 'বেশ কথা—তা বলে কী প্রেম আপাতত মুলতুবী থাকবে ? বাঃ—'

কমল জবাব দিয়েছিলো। 'থাকবে। কামানের গোলায় যখন পায়ের

তলে মাটি মুহু মুহু কাঁপছে তখন কোন্ উচ্চ বৃক্ষচূড়ে প্রেমের নীড় বাসা বাঁধবে! মধ্যবিত্তসুলভ বিকার চিন্তাধারাকে পরিহার করো। আগে এসো—তোমার-আমার পায়ের তলের মাটির জন্য যুদ্ধ করি। প্রেম করবার অবসর পরে আসবে প্রচুর—'

প্রেম—প্রেম—প্রেম। ছুটো কামান্ধ কুকুর পরস্পরের দেহ কামড়া-কামড়ি করছে। প্রেম? না, লিগ্যাল পাসপোর্ট অব প্রস্টিটিউশন!

দুপুরের আকাশ রোদে ঝাঁঝাঁ করছে। বেসুরো গলায় কাক ডেকে চলেছে।

পদ্ম বসে বসে ওর ছেঁড়া সেমিজ সেলাই করছিলো।

হঠাৎ রাস্তা থেকে ভেসে এলো জমাট কোলাহলের শব্দ। বহু কণ্ঠের।

কী হলো? সেমিজটা ফেলে ধড়মড়িয়ে বাইরে কপাটের পেছনে এসে দাঁড়ালো ও।

উঁচু রাজপথ নাক বরাবর সোজা দৌড়েছে। পা ফেলে ফেলে দূর থেকে এগিয়ে আসছে দানা-বাঁধা মিছিলটা। কালো কালো মাথা ছাড়িয়ে বাঁশের মাথায় আঁটা চাটাইয়ের ওপর কী লেখা, কতোগুলো লাল নিশানা ত্বলছে আগুনের মতো। চীৎকার করছে মিছিলের যাত্রীগুলো। কী বলছে ওরা?

মিছিল এগিয়ে আসছে এদিকে। যেন পদ্মর কাছেই ছুটে আসছে ওরা ঢেউ ভেঙে ভেঙে। পদ্ম কেঁপে উঠলো. শিরশির করে উঠলো বুকের ভিতরটা।

নিশানগুলো পত পত করে উড়ছে। ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে রক্তের মতো লাল রঙগুলো! তুলছে পতাকাগুলো—এক তুই তিন…

আওয়াজ এবার পরিষ্কার হয়ে কানে বাজে।

—ভাত কাপড় রুটি দাও—নইলে গদি ছেড়ে দাও—

পদ্মর মুখখানা কাগজের মতো শাদা হয়ে উঠেছে। ভাত…কাপড়! ভুখা জনতা দাবী জানাচ্ছে ভাত-কাপড়ের। কেন? ওরা কী কেউ খেতে পায় না! কেউ না! বাপের বাড়ির চিত্রগুলো ভেসে ওঠে ওর মনে। সেই সেবার! (মদনদা!)…তবে সেবার তো দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো—দুর্ভিক্ষ কেন হয়? মদনদার গোলায় তো প্রচুর ধান উঠেছিলো, গোলা বাড়াতে হয়েছিলো ওদের। বাড়তি ধান বেচে দিয়েছিলো মদনদারা শহরের ব্যাপারীদের কাছে…প্রচুর টাকা পেয়েছিলো!…কেন এমন হয়? পদ্মদের মতো বেশির ভাগ গাঁয়ের লোক তখন খেতে পাচ্ছে না—নেই নেই নেই! এরই নাম দুর্ভিক্ষ! পদ্মরা খতে পাবে না আর মদনদারা বাড়তি ধান বেচে লাল হবে!…দুর্ভিক্ষ তো কবে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আজো তো বাপের বাড়ির দেশে পাকিস্তানে চালের দর চল্লিশ টাকা! চাল নেই—এখানে এই হিন্দুস্থানেও চালের দর আটত্রিশ টাকা! লোকে খেতে পাচ্ছে না। দুর্ভিক্ষ কবে আসবে এবার?

মিছিল এবার বাড়ির সামনে।

শুধু পুরুষেরাই নয়, মেয়েরাও জড়ো হয়েছে মিছিলের মধ্যে। বস্তির মেয়ে বউ। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, উশকো খুশকো চুল, খালি পা, কোলে কাঁখে কারুর ছেলে মেয়ে।

পদ্মর চোখে বিস্ময় ঠিকরে পড়েছে। মেয়েরাও নেমে পড়েছে। সবারি আগে ওরাই।

কোথায় যাবে মিছিলটা এবার? কোন দিকে কতোদূরে, কোথায় গিয়ে মিশবে শেষে?

মিছিল পার হয়ে যেতেই এবার যেন কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো পদ্মর।

এর মধ্যে কোথায় যেন একটা হ্যাংলাপনা মেশানো রয়েছে। নয়তো কী! আমি খেতে পাবো না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচার করবো! ছি-ছি-ছি! না বাবা, অতোখানি নির্লজ্জ নয় ও। খেতে পাবে না—অন্ধকারে ঘরে চুপ করে বসে থাকবে, কেন এই লজ্জাকে কানাকানি করে জানাবে দশ জনের মধ্যে! কই, সেবার দুর্ভিক্ষের সময় তো এমনি বেহায়ার মতো পারতো ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে, কই করেনি তো। কেবল মদনদার কাছে আর না পেরে বলে ফেলেছিলো ও। সে কিছু নয়। দুর্ভিক্ষের পরেও কতোদিন কতো বেলা বাড়িতে না খেয়ে কাটিয়েছে, কই জানে কেউ? পদ্মদের বাড়ির শিক্ষাই তা নয়। মনে পড়ে একদিন রাত্রে জ্যেঠিমা চীৎকার করে উঠেছিলো, জ্যেঠা মহাশয় থামিয়ে দিয়েছিলেন জ্যেঠিমাকে: 'ছি, লোকে জানতে পারবে যে।' জ্যেঠিমা ভুল বুঝতে পেরে ভয়ে থেমে গেছিলেন। ছি ছি ছি!

ভগবান সবাইকে সবসময়ে সুখে রাখেন না। যারা গরীব তাদের কতো রাত্রে উপোস করেই কাটাতে হয়—এই তো নিয়ম! তবে আর ধনী গরীব সৃষ্টি হয়েছে কেন! চেষ্টা করতে হবে—রোজগার করতে হবে, তাহলেই ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। প্রত্যেকে ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে!···

কিন্তু···মিছিলের কণ্ঠস্বরটা ভিখিরীর মত শোনায় না! শোভাযাত্রা করে, চীৎকার তুলে, জোট পাকিয়ে যেন দাবী জানাচ্ছে ঐ ভুখা জীবগুলো। 'ভাত কাপড় রুটি দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও'—ফতোয়া জারী করছে যেন ওরা। গরীব মানুষের দুবেলা পেটপুরে খাবার অধিকার আছে, খেতে দিতে হবেই! কে দেবে খেতে সরকার, না, মদনদারা?

আচ্ছা—সকল লোকেরই খেতে পাবার অধিকার আছে! তবে গরীব সৃষ্টি হয় কেন? মদনদাদের জোত আছে, জমি আছে—গরীবদের

কী আছে? খাটবে—খাবে। ওর স্বামী খাটছে খাচ্ছে। ওরা খাটতে পারে না? কিলবিল করে অনেকগুলো কথা ঝড় তোলে পদ্মর মনে! ঠাকুরপো। 'খাটতে চায় ওরা—কিন্তু কাজ কই!' তাইতো! ওর স্বামীর আফিসেই তো খাটছিলো লোকগুলো, হঠাৎ কাজ চলে গেলো!

পদ্ম হাল ছেড়ে দিলো: কী জানি বাবা কিছু বুঝতে পারি না। দুনিয়াটা যে কিভাবে চলছে! তবু···খেতে দাও বলে রাস্তার মধ্যে এমন চীৎকার করার কথা বরদাস্ত করতে পারে না কিছুতেই। স্বপ্নেও ভাবতে পারে না!

সন্ধ্যে বেলার ঘটনা স্তম্ভিত করে দিলো পদ্মকে।

হাঁড়িতে জল চাপিয়ে চাল ধুচ্ছিলো ও। বাড়িতে কেউ নেই। দিদিমা বেড়াতে গেছেন—শ্বশুর ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী। স্বামী ফেরেনি এখনও আফিস থেকে।

বাইরে থেকে চীৎকার ভেসে এলো: 'কে আছেন বাড়ীতে?'

পদ্ম ধড়ফড়িয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি আঁচলে হাত মুছে উঠে এলো ও।

কয়েকজন লোক ধরাধরি করে আনছে ওর স্বামীকে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা, রক্তে ভেজা জামা কাপড়।

এ্যা! সজোরে ঠোঁট কামড়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইলো পদ্ম।

'চলুন—এঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসি—'

পদ্ম আগে আগে পথ দেখিয়ে চললো। আস্তে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। মরার মতো মুখ করে চোখ বন্ধ করে রয়েছে লোকটা। কী করে ঘটলো এই দুর্ঘটনা!

'আপনি একটু বাইরে আসুন—'

পদ্ম পায়ে-পায়ে মূঢ়ের মতো বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালো।

কী করে হলো এই দুর্ঘটনা!

'অনেক দিন বারণ করেছি বলাই বাবুকে। ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না! কিন্তু···ধর্মঘটী কর্মচারীরা সব ক্ষেপেছিলো, আজ সন্ধ্যের সময় লুকিয়ে হেঁটে ফিরতেই ওরা লাঠি দিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছে। দালালকে হয়তো শেষ করে দেয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু পারেনি। কেন জানেন উনি কমলবাবুর দাদা বলে! আচ্ছা চলি—আঘাত এমন কিছু বেশি নয়, ভয়ের কারণ নেই। ভবিষ্যতে ওকে শোধরাবার চেষ্টা করবেন। নইলে···আচ্ছা নমস্কার—'

হুড়মুড় করে চলে গেলো লোকগুলো।

পদ্ম অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঘরে এসে স্বামীর বিছানার কাছে এগিয়ে গেলো।

অন্য সময় হলে কেঁদে ফেলত পদ্ম, কিন্তু আজ আর ওর চোখে জল এলো না। যে লোকটাকে এতদিন ঘৃণা করতো, আজ যেন তাকে করুণা জানাতে ইচ্ছে হলো!

চিরঞ্জীব আর পাপড়ীর জগৎ!

ইজিচেয়ারে দেহভার ছেড়ে দিয়ে পড়েছিলো চিরঞ্জীব।

লঘুপায়ে পাপড়ি ঘরে ঢুকলো। অতর্কিতে চিরঞ্জীবের দিগভ্রান্ত চোখ দুটো চেপে ধরলো।

চিরঞ্জীব হাসলো। হাতটা চোখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাছে টেনে নিলো পাপড়িকে।

পাপড়ি চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। সে-চোখে আদিম জান্তব ক্ষুধাগ্নি। হ্যাঁ। এ-এক নতুন এ্যাডভেঞ্চার—নাই থাক চিরঞ্জীবের অর্থ। সে

প্রেমিক, সে শিল্পী। ধনীর দুলালদের প্রেমের মধ্যে পালনে আর উচ্ছ্বাস ভাবটুকুই বেশি। নেমে এসেছে পাপড়ি তার আভিজাত্যে-মোড়া জীবনের স্তর থেকে, মধ্যবিত্ত কবিকে নিয়ে কাটুক কিছুদিন, তারপর দেখা পেলে লেডী চ্যাটার্লীর মতো নেমে যাবে শক্ত সোমত্থ যোয়ান মজুর প্রেমিকের সংগে। জীবনকে চুমুকে চুমুকে পান করতে হবে, আস্বাদন নিতে হবে ধীরে ধীরে। আর এই তো জীবন!

বিবাহ! পাপড়ি নাক সিঁটকালো।

ড্রাই! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর। কী লাভ আছে সারাজীবনে এক ব্যক্তিবিশেষের শয্যাসংগিনী হয়ে—কী লাভ আছে একজনের কাছে দেহকে ভাড়া দিয়ে! হরিবল্! একটিমাত্র লোক —তার ভালো-লাগা না লাগার পর কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে নারীর জীবন—ওকে আরাম আর উত্তেজনা যোগান দেবার জন্যে নিজেকে ভরে রাখতে হবে দৃঢ় মাংসপেশী আর নরম উষ্ণ রক্ত মাংসের পিণ্ড নিয়ে। আর ঐ লোকটির আয়ুষ্কালের সংগে সংগে ফুরিয়ে যাবে মেয়েদের জীবনের কামনা-বাসনা!

না—তার চেয়ে এই দুরন্ত প্রজাপতিপনা ঢের ভালো,ঢের বেশি জীবন্ত!

চিরঞ্জীব ওর পাখির শাবকের মতো তুলতুলে দেহকে তার হৃদপিণ্ডের সীমানায় নিয়ে এসেছে। পাপড়ির নবনীত দেহের গ্রন্থিভার, আপেলের মতো দুটো পীনোদ্ধত বক্ষের উদ্ধত ঘোষণা। নিষ্পেষিত হয়। ভালো লাগে তবু।

'উঃ—' ছদ্মরোষে প্রতিবাদ করে উঠলো পাপড়ি: 'তুমি দিন দিন পশু হচ্ছো!'

চিরঞ্জীব হাসলো মাতালের মতো। 'পশুধর্মের ওপর মানুষ কতোখানি সভ্যতার পলেস্তারা চাপিয়েছে সেই প্রশ্ন!'

পাপড়ির চোখে আগুনের শাপ। 'বটে! ডন জুয়ান হবার ইচ্ছে হচ্ছে! জানো ঃ এই বর্বরতার জন্যে সভ্যতা তোমাকে একঘরে করবে!'

'সভ্যতা!…ওর বাজার দর কতো—' উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে চিরঞ্জীব।

'আঃ ছাড়ো ছেলেমানুষের মতো তোমার খিদে।'

'আরও এক পা এগিয়ে যেতে পারো। কুকুরের মতোও বলতে পারো—' চিরঞ্জীব হাসলো নির্লজ্জের মতো।

পাপড়ি তর্জনী তুললো। 'ইউ নটি বয়—ডোণ্ট বি ভালগর প্লিজ—'

চিরঞ্জীব হাসলো ফের। 'এ তোমার কুসংস্কার। লরেন্সের ছত্রগুলি কী আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে আদর্শ কুমারী?' আবৃত্তির ঢঙে বলে উঠলো ও।

'Sex isn't sin, its a delicate flow between
women and men,
And the sin is to damage the flow, force
it or dirty it or supress it again!'

পাপড়ি চিরঞ্জীবের মুখ চেপে ধরলো। 'আঃ চুপ করো—দুষ্টু ছেলে!'

চিরঞ্জীব কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালো, 'বেশ। তার আগে—'

'না না। এখন না। তুমি কী পাগল?'

চিরঞ্জীব সত্যিই পাগল। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে ওর নরম শরীরটাকে!

চোখ দুটো ক্ষুধার্ত দুর্ভিক্ষের মতো জ্বলছে, গুন গুন করে গান গেয়ে উঠেছে ওর সারা অন্তর।

'Brightest truth, purest truth in the universe
All were for me in the kiss of one girl!'

পাপড়ি হাঁশপাঁশ করে উঠলো।

'আঃ, সত্যি ছাড়ো—'

পাপড়ি বেশবাস সংযত করে উঠে পড়লো। দ্রুত লয়ে স্ফীত স্ফীত দুলে দুলে উঠছে ওর, ঠোঁট দুটো হাওয়া লাগা পাপড়ির মতো কাঁপছে চোখ দুটো পরিশ্রান্ত, চুলগুলো বাঁধন হারিয়ে পুঞ্জীভূত কালো ইশারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের দুধারে। বহির্বাসের দিকে তাকানো যায় না! যেন এক দুরন্ত শিশু ওর সারা শরীরের ওপর দিয়ে উৎপীড়নের রথ চালিয়ে গেছে।

এই মুহূর্ত্তটুকু ভারী ভালো লাগে চিরঞ্জীবের। আমোদ হয় পাপড়িকে দেখে—তারই আক্রমণের নখাঘাত ওর সর্বাংগে।

'আমি যাচ্ছি—' পাপড়ি ঠোঁট ফুলিয়ে ঘোষণা করলো।

'কোথায় ?'

'বাড়ি—'

'বাড়ি !···আজকে তো তোমার বাড়ি যাওয়ার কথা নয়। আজকের রাত্তিরটা তো আমারই প্রাপ্য !' চিরঞ্জীব ওকে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলো।

'না—'

'ভয় হচ্ছে ?'

পাপড়ির চোখদুটো ভাষাময় হয়ে উঠলো। 'ভয় ! তোমাকে ?'

'তবে—?'

'জানিনে !'

'রাগ হয়েছে—বুঝতে পারছি। তবে বাড়িই যাও। অভাব-বোধ করলে ফিরেই এসো—দোর খোলাই রইলো—'

পাপড়ি নাক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেলো ঝড়ের মতো।

ফুটপাথ ধরে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলেছিলো ও।

পেছনে কে ডাকলো।

'কে? শ্যামলী—'

'হ্যাঃ চিনতে কষ্ট হচ্ছে। সে যাক। ব্যাপার কী তোর। অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করলি কবে থেকে?'

'মানে?'

'মানে—একবারও ভুলে আমাদের বাড়িতে পা দিসনে। আর কলেজেও তো দেখা পাওয়াই ভার! ইদানীং কলেজে না-যাওয়াটাই তোর রেগুলারিটি হয়ে পড়েছে—'

'তারপর?' পাপড়ি ভুরু কুঁচকালো।

'তারপর—ভারি তেষ্টা পেয়েছে ভাই। চা খাওয়াবি—?'

'চলো—'

দুজনে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। দুটো চেয়ার টেনে মুখোমুখী বসলো।

নিস্তব্ধতা।

শ্যামলী সহসা জিগ্যেস করলো: 'চিরঞ্জীবের খবর জানো নিশ্চয়ই...'

পাপড়ি চমকে উঠলো অজ্ঞাতে। মুখখানা শক্ত করে বললে, 'কী খবর জানতে চাও?'

'যে খবর শুনছি ইদানিং—'

'যা শুনছো তাতে ভুল নেই।'

শ্যামলী বিদ্রূপ করে উঠলো: 'এটিও লভ্ এট দি ফার্স্ট সাইট বুঝি?'

পাপড়িও তেমনভাবে জবাব দিলো: 'না। ফোর্স্ড্ লভ,—নেসেসিটিও বলতে পারো।'

শ্যামলী বললে, 'কতোদিন—?'

'যতোদিন এর চলা উচিত। যেদিন এর আয়ু শেষ হবে সেদিন সহজ ভাবেই এর কবরকে মেনে নেবো।'

আবার নিস্তব্ধতা।

পাপড়ি চা শেষ করলো তাড়াতাড়ি। বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

রাস্তায় নেমে জিগ্যেস করলো শ্যামলী : 'এবার কোথায়, বাড়ি ?'

'না। চিরঞ্জীবের বাসায়। আচ্ছা চলি—'

জনতার বন্যায় হারিয়ে গেলো পাপড়ি।

শ্যামলীর কাছে অতি সহজে উচ্চারণ করে এলেও জীবনের পিছিল পথে নামতে পারেনি শিবানী। অসহায়ের মতো মাথা চেপে ধরে পড়ে রয়েছে বিছানায় নিঃসাড়ে। কিন্তু আর কতোদিন !···

বাড়িতে চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

বিধবা মা···ছোট ছোট ভাইবোন গোরুর মতো ড্যাবডেবে চোখে শুধু ওরই দিকে চেয়ে আছে। মা কিছু বলে না। রাতের অন্ধকার বিছানায় মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদে। ভাই বোনেরা পর্যন্ত খাবার জন্যে বেশি চেঁচামেচি করে না। নিঃশব্দে মূক প্রার্থনার ভাষা পাথর করে তোলে শিবানীকে।

চললো কয়েকদিন মায়ের যা কিছু গয়না বেচে। শিবানী হাতের দুগাছা ঝিকঝিকে সোনার চুড়ি খুলে ফেললো। কিন্তু দারিদ্রের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে কতোক্ষণ লড়বে !

কাল থেকে সারা বাড়িতে খাওয়া জোটেনি।

মা কোলের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা মেজের ওপর পড়ে রয়েছে, বাচ্চাগুলো পর্যন্ত যেন বুঝতে পেড়েছে অভাবকে। বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে ওরা। কিন্তু মুখ শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে ওদের, এলিয়ে পড়েছে নিস্তেজে।

এমন করে চলে না। চলবে না।

কি করা যায়?

শিবানীর ভাবনায় কোন পার মেলে না।

মিঃ বসুর কুৎসিৎ নিমন্ত্রণ। আগামী দিনে প্রচুর টাকা। টাকা—টাকা—টাকা! সিনেমার স্টার! কিন্তু ওর সুপারিশের বোনাস! …'একটা রাত্তির আমাকে চায়!' শুধু একটা রাত্তির—তার বদলে ভবিষ্যতের রূপোর চাকতির ধাতব ঝংকার। সে-শব্দ কী কানে শুনতে পাচ্ছে ও?

না—না—না! মাথাটা ঝনঝন করে ওঠে শিবানীর। পারবে না—পারবে না ও!

তবু…বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে। বাপ মা চিরকাল রোজগার করে ছেলে মেয়েকে খাওয়ায় না, ওদের রোজগারেও তারা বাঁচতে চায়! মেয়েরা কি রোজগার করে না? ভাবনা ছিলো মা'র যদি ম্যাট্রিকটা দিতে পারতো। কিন্তু…

রাত কতো?

রাত বারোটার আওয়াজ ভেসে এলো. দূরের ট্রেজারির ঘড়ি থেকে।

জানালার বাইরে তারা-ছিটানো আকাশ, ক্ষীণ হাওয়া বইছে থেকে থেকে।

হঠাৎ চোখে পড়লো পাশের উদ্ধত তেতলা বাড়ির জানালাটা। সবুজ নরম আলো কী স্বপ্ন বুনছে ওখানে? মিঃ বসুর ঘর। জেগে আছে লোকটা।

শিবানী যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়ালো বিছানা থেকে। আলনা থেকে পাতলা চাদরটা টেনে জড়িয়ে নিলো গায়ের ওপরে। আলুথালু চুলগুলো উড়ছে ওর… মুখচোখ এক নিরুদ্ধ উত্তাপে থমথম করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও।

মা জিগ্যেস করলো, 'এতো রাত্তিরে চললি কোথায়?'

'আসছি—'

রাজপথ।

রাত বারোটার শহর। নিঝুম।

গা ছমছম করে উঠলো, পা দুটো কেঁপে উঠলো। গলার ভেতরটা শুকিয়ে খসখসে কাগজের মতো হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে বেরালের মতো জ্বলছে ওর চোখ।

গায়ের চাদরটা টেনে জড়িয়ে দ্রুতপায়ে নেমে পড়লো পথে। কয়েক পা। তারপরেই মিঃ বসুর হালফ্যাশনের বাড়ি।

হাসি পেলো কমলের!

প্রবন্ধটা হাসির নয়, তবু হাসি পেলো।

লিখছেন কঙ্কর সেনের প্রথিতযশা লেখক।

'...আমাদের সময়ে মাথা থেকে প্লট খুঁজে লিখতে অনেক ধৈর্য আর অনলস চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করতে হয়েছে আমাদের। এখনকার দিনের মতো তখন 'চাষী মজুর' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', আর 'জয় হিন্দ' ছিলো না, 'তে-ভাগার' আন্দোলনও হয়নি। তাই আজকে নাটক নভেলে দেখছি কেবল স্লোগান আর লালঝাণ্ডা, স্ট্রাইক আর শোভাযাত্রা! আমরা কী রকম লিখেছি সে কথা সাধারণ পাঠকবর্গ বিচার করবেন। তবে আমরা এইটে জোর গলায় ঘোষণা করতে পারবো যে, আমরা যা লিখেছি তা খাঁটি রসসাহিত্য, আজকের দিনের মতো প্রোপাগাণ্ডা-সর্বস্ব নয়!'

হাসি পেলো কমলের আবার।

আত্মমর্ষী ফ্রয়েড আর লরেন্সের আর একটি চেলা! সেক্স—সেক্স—

সেক্স। নরনারীর আর কোনো সামাজিক স্থিতি নেই, যৌনকামনার বৃত্তের মধ্যে বাঁধা ওদের জীবন! যাযাবরের মত ছুটো অসামাজিক নর-নারী, ভোগ আর ইন্দ্রিয়ের ক্লীব দাসত্ব! বোহিমিয়ান জীবন-বেদ, না, সেক্সচুয়াল পারভরশান! মন—কেবলমাত্র মনই সব! নিজের চরিত্রকে খণ্ড খণ্ড করে উপন্যাসের নায়কের মধ্যে দিয়ে আত্মরতি, যৌন আবেদনের নিবৃত্তি!···

শরৎ চ্যাটার্জীর কথাগুলো মনে পড়ে গেলো এই সময়েঃ "আধুনিক কালের কলকারখানাকে নানাকারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই, বরঞ্চ ওইটেই আজ ফ্যাশান! এই বহু-নিন্দিত বস্তুটির সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলিও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষীদের সংগে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপসোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কী দিয়ে? কলহ দিয়ে বা কটু কথা দিয়ে? কবি বলছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু 'মূলনীতি', লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কী? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।···"

কঙ্কর সেনের নামজাদা লেখক শরৎবাবুর বক্তব্যের মধ্যে ক্ষেদোক্তির জবাব পাবেন কি?

দুঃখ করেছিলেন সেদিন প্রফেসার হালদার।

'বড়োই দুঃখের বিষয়ঃ আজকের সাহিত্যিকরা পুরানোদের একেবারে কেটে বাদ দিয়েছেন, একেবারে মানছেন না অতীতকে!'

এরও উত্তর শরৎচন্দ্র থেকে দিয়েছিলো কমল।

"আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরনধারণ, চরিত্রসৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন।...অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধাবোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তু ধরিয়াই পড়িয়া থাকিতাম, তো কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাংলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্তত করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড়ো করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তো সে তাঁহার মর্যাদা হানি করা নয়। এবং যদি সত্যিই তাঁহার ভাব-ভাষা, ধরন-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি তো দুঃখ করিবার কিছু নাই।..."

খবরটা এলো বিকেলে।

কমরেড সিদ্দিক অ্যারেস্ট হয়েছে।

ঘটনার পশ্চাদপটের কাহিনীটি এইরকম :

গাঁ থেকে এসেছিলো কিসান মেয়েদের মিছিল। ভাতের দাবী নিয়ে। অন্ধকার বস্তিতে বিছানায় শুয়ে রক্ত তুলে কাশতে আর পারছিলো না সিদ্দিক। নিরুত্তেজ ঠাণ্ডা জীবন ধৈর্যহীন, মরীয়া করে তুলেছিলো ওকে। কারু নিষেধ মানেনি। এক হাতে ময়লা রুমালটা মুখে চেপে ধরে বেরিয়ে

পড়েছিলো ও মিছিলের নেতৃত্ব নিয়ে। ভুখা জনতার চীৎকার কাঁপিয়ে তুলেছিলো শহরের নিশ্চিন্ত প্রাসাদবাসীদের, শিউরে উঠেছিলো বোবা রাজপথ। সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে কালেকটারের কুঠির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো ওরা।

ক্ষুধিত বিপজ্জনক লোকদের বেআইনী ক্ষুধাকে জব্দ করবার জন্যে রাইফেলধারী পুলিস এলো যথানিয়মে। হঠ যাও—হঠ যাও। মিছিল অনড়। বেয়নেটের গুঁতোয় সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চললো মৃদু বলপ্রয়োগের টেকনিকে। বজ্জাত জনতা তবু সরবে না এক পা। অগত্যা পুলিস কর্ডন করে ফেললো মিছিলের অগ্রগামীদের। জন কুড়ি মেয়ে পুরুষের সাথে ফেরারী কমরেড সিদ্দিকও গ্রেপ্তার হলো।

জেলের হাজতে বসে কমরেড তুমি কি এখনো কাসছো? ভিজে উঠেছে কী তোমার ময়লা রুমাল তোমার জখমী রক্তে?

আকাশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে হাওয়া ভেসে আসছে।

সন্ধ্যার ধূসরতা বিষণ্ণতা ছড়িয়েছে মেঘে মেঘে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এলিয়ট পড়ছিলো পাপড়ি।

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rat's feet over broken glass
In our dry cellar···

ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না।

কার কথা মনে পড়ে? কমল!

চোখ দুটোয় শীতের নদীর ছাপ পড়ে পাপড়ির। একটা পূর্ণহীন এষণার উৎপীড়নে বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। প্রতিহিংসার এক ঝলক আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে চোখের প্রান্তে। হার স্বীকার করেছে ও সত্যিই। তবু···চিরঞ্জীবকে খশিয়ে দিয়েছে কমলের আকাশ থেকে, বিপ্লবী কবিকে ভেঙেচুড়ে ছত্রখান করে দিয়েছে কাচের বাসনের মতো। যা হোক কমলকে আঘাত হানতে পেরেছে এইটুকুই ওর নগদ সান্ত্বনা। এ এক অদমিত অদ্ভুত উৎকট আমোদ। ওর লোকশান কতটুকু! চিরঞ্জীবকে ভালো না লাগলে ভাঙা ঘরের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। চিরকুমারিত্বের শাশ্বত সার্টিফিকেট নিয়ে আবার সমাজে ঘুরে বেড়াবে ও। নতুন শিকার, নতুন ফ্লার্ট।···

কিন্তু চিরঞ্জীব ফিরছে না কেন এখনো?

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken joy of our last kingdoms
In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river···

উঃ চিরঞ্জীব বড্ড দেরী করছে। ওর ফেরা উচিত এতক্ষণে। দিনকে দিন কী হচ্ছে ও। নাঃ বকে দিতে হবে।

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

চিরঞ্জীব স্খলিত চরণে এসে ঘরে ঢুকলো।

'এই যে তুমি কখন !' চিরঞ্জীব হাসলো টেনে টেনে।

পাপড়ি হাসলো না। গম্ভীর হয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলো : 'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

চিরঞ্জীব কাঁধ ঝাঁকালো। 'হা হতোস্মি। আমি যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছিলাম...'

ও বসলো এসে পাপড়ির বুকের কাছে।

'শোনো—আজ একটা কবিতা লিখেছি—হ্যাঁ তোমাকে উদ্দেশ্য করে—'

পাপড়ির রাগের তাপ গলছে। 'ওমা তাই নাকি ? এতো কবিতা লিখছো কী করে !' আত্মপ্রসাদের ভংগীতে মুখ টিপে জিগ্যেস করলো ও।

'অনুপ্রেরণার উৎস যে হাতের নাগালে...'

'তাই নাকি ! কোথায় ?'

'এই যে তোমার চোখ মুখ, দেহের প্রতিটি ভাঁজ...'

'থামো—' ছদ্মরোষে বলে উঠলো পাপড়ি : 'অসভ্য কোথাকার !'

উত্তর দিলো না চিরঞ্জীব। উচ্ছৃঙ্খল হাতে আলুথালু করে দিলো ওর কালো চুলের রাশি।

এলোমেলোভাবে বললে, 'হে উন্মত্ত রাক্ষসী—আকণ্ঠ নিমজ্জিত করো পুঞ্জীভূত কালোর বন্যায়। আপনারে করো বিস্মরণ...'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো পাপড়ি : 'কী খেয়েছো তুমি ?'

চিরঞ্জীব ঘন ঘন মাথা দোলালো ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো : 'কিচ্ছু খাইনি—একদম বাজে কথা...'

স্তব্ধ কণ্ঠে পাপড়ি মাথা নাড়লো : 'নিশ্চয়ই মদ খেয়েছো···
আমার টাকাগুলো নিয়ে এমনি করে ওড়াচ্ছো তুমি। ছিঃ লজ্জা করে না ?'

'আঃ—প্লিজ, প্লিজ সুইট্-হার্ট—ডোণ্ট ট্রাই টু আটার সারমন্স। প্লিজ। খেয়েছি—খেয়েছি—খেয়েছি : A drink of wine makes things rosier···

'ভেঙে পড়ো বুকের ওপর
ঝরে পড়ো নিঃশব্দে, নিঃশেষ ঝড়ে
আচ্ছন্ন করে
বিলুপ্ত করে :
সমস্ত বিশাল রাত্রিকে বিচুর্ণ করে
দুই আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে-ধরা পাকা আঙুরের মতো···'

চিরঞ্জীবের উন্মত্ত হাসিতে ঘরখানা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

'ছাড়ো, সরে যাও পশু কোথাকার—' পাপড়ির গলার স্বর কর্কশ আর বেসুরো। 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি—' চিরঞ্জীবের এই নূতন অস্বাভাবিক রূপ দেখে ও ভয় পেয়ে গেছে, থর থর করে কাঁপছে ওর হৃদয়ের বেলাভূমি।

চিরঞ্জীব অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে ওকে। রক্তে ভ্যাম্পায়ারের গর্জন।

কেঁদে ফেললো পাপড়ি। অসহায় শিশুর মতো। মুমূর্ষু চিঁচিঁ স্বর বেরলো ওর কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে।

'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও তোমার পায়ে পড়ি—'

চিরঞ্জীব নির্দয়। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নেমে পড়েছে ও। দুহাতে ফূর্তিতে উড়িয়ে দেবে লাভাস্রোত। নিজেকে পুড়িয়ে ফেলবে। ভয় নেই।

পাপড়ির আজকের এই মনোবিকারের মধ্যে বৈচিত্র্য পেয়েছে ও।

আজ আর নিভন্ত ঠাণ্ডার মতো ও সর্বশরীরে জড়িয়ে নেই। মনে হচ্ছে : একটি অনভ্যস্ত কুমারীকে আকর্ষণ করেছে। নিস্পেষণের খর তাপে গলে গলে যাচ্ছে কুমারীর অনাস্বাদিত হৃদয়। ভালো লাগছে। পাপড়িকে আজ ভারি ভাল লাগছে। উল্লাসে নেচে উঠলো চিরঞ্জীব : পাপড়ির এই ঘুমিয়ে পড়া উদ্ভিন্ন কুমারীপনা লুকিয়েছিলো কোন্ অন্ধ গুহায় এতোদিন!

পাপড়ি ছটফট করছে। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে যেন। ওর কাজল-আঁকা চোখের কিনারায় জলের বাঁধ-ভাঙা উচ্ছাস। মনের বিক্ষুব্ধ আগুনগুলো যেন নিঃশেষে দ্রব হয়ে ঝরছে।

গাঁয়ে গিয়েছিলো কমল।

হরিনখালিতে জমি নিয়ে লড়াই বেঁধে গেছে। চাষী আর জমিদারের মধ্যে। শহর থেকে সেপাই গিয়েছিলো দাংগা থামাতে। গুলি চলেছে কয়েক রাউণ্ড··· রক্ত বয়েছে কালো মাটিতে, হত আহত হয়েছে প্রচুর। কী আশ্চর্য প্রতিরোধ চাষীদের—জমির দখলীস্বত্ব ছাড়েনি কিছুতেই। পৌষালী ফসল উপচে উঠেছে ধানক্ষেতে···সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে যুদ্ধ করেছে ওরা। পুলিস এলে আড়ালে গেছে, সেখান থেকে লুকিয়ে যুঝেছে সৈনিকের মতো। পুলিস ধরতে পারেনি একজনকেও। নিহত আর আহত শহীদ একটিকেও ওরা শত্রুর হাতে সমর্পণ করেনি। পাহাড়ে জংগলে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। আবার শপথ নিচ্ছে, প্রস্তুতি গড়ছে অবিশ্রান্ত লড়াই চালাবার।

সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছে তাই কিসান ছেলেপিলে বউঝেটিদের ওপর। ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, ঘরের বাসন কোসন ছিঁচকে চোরের মতো আত্মসাৎ করেছে। গোরু ছাগল পর্যন্ত বেআইনী চালান করে দিয়েছে সেপাইরা।

শিশুদের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পাগলের মতো খুঁচিয়েছে, বউ বেটিদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে উলংগ করে হেসেছে, যোয়ান মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে গাছের নিচে বেইজ্জতী করেছে।

তবু···দমেনি সারা গ্রাম। সারা এলাকায় চালায় চালায় ডাইনীর চুলের মতো নৃত্য জুড়েছে লোভী আগুন। কিন্তু বুকের জ্বালাময় আগুনকে নিভোবে কী করে ওরা! মেয়েরা দাঁতে দাঁত এঁটে শপথী কাঠিন্যে শক্ত হয়ে রয়েছে। কতো অত্যাচার হানবে দুশমনেরা—বুকের কলিজা ছাড়া আর কিছু নিতে পারবে না। জান দেবে—ভয় পায় না তারা!

থমথম করছে সারা হরিনখালি। রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এসেছে কমল। শহরে থেকে আক্রমণের প্রচণ্ডতাটা ঠিক গভীরভাবে বুঝতে পারতো না। কিন্তু দেখে এসে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে ও। এতোটুকু অতিরঞ্জিত নেই। এই চলেছে সারা গ্রাম জুড়ে—লক্ষ লক্ষ গ্রাম ব্যেপে একই অধ্যায়।

ভাঙেনি ওরা। লড়াই তো চলবেই। ভাঙবার কী আছে? দুহাতের লোহার শেকল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই!

বেলা চড়ে গেছে। খিদে পেয়েছে প্রচুর। গ্রামে খাবার পাওয়ার উপায় নেই। থাকলেও খেতে পারতো না।

রাস্তার মোড় নিতেই—আবার সেই চার চোখ! সবুজ সার্ট, পায়ে কালো বুট। কার্তিক টিকটিকী। ওকে দেখে আবার সেই অন্যমনস্ক ভাব দেখানো!···ভোরে গ্রামে যাবার সময়ে অনেকদূর পর্যন্ত ও অনুসরণ করেছে কমলকে। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে—গ্রাম থেকে ফিরে আসছে কমল।

কমল হাসলো। বাইরের পৃথিবীটা যেন ছোটো হয়ে কারাপ্রাচীরের মতো হয়ে আসছে। অপেক্ষা করছে জেলের সেই লৌহ-কপাটটা—যার

ভীষণ হাঁরের মধ্যে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে বিপজ্জনক লোকগুলো। যাক—প্রাণ ভরে টেনে নিই বাইরের জগতের স্বাধীন হাওয়া, আলো গন্ধ রং—

সেদিন আরো একটা চিঠি এসেছে 'দৈনন্দিন' পত্র থেকে।

'লিখুন—লিখন। একী ব্যাপার! লেখক কমল লাহিড়ী কী এর মধ্যে ফুরিয়ে গেলো!'

কমল হাসলো। লিখবো—লিখবো সত্যি কথা। কিন্তু পারছি কই লিখতে? জ্বলছে লক্ষগ্রাম, হিমালয় থেকে দাক্ষিণাত্য—দাউ দাউ করে লেলিহান রক্তিম আগুণের সৌন্দর্য...বিস্তৃত জীবন চাচ্ছে ডানা মেলতে—উদার মহান ভবিষ্য...

আজকের লেখক শুধু লেখক নন্, কর্মীও। বিশ্বাস করুন আমি আর পারছিনে। আমি আজ কর্মী হতে চাই, তাতে লেখক মরে গেলে আমি উপায়হীন।

'বৌদি—ও বৌদি খেতে দাও শীগগির—'

জামাটা টান মেরে খুলে ফেললো কমল। ভয়ানক খিদে। রক্তগুলো যেন গর্জন শুরু করেছে ভুখা বাঘের মতো। আর পারছে না। পেট জ্বলে যাচ্ছে।

'ও বৌদি খেতে দাও শীগগির—'

বারান্দায় এলিয়ে পড়ে নিঃসাড়ে বসেছিলো পদ্ম। ওর চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো কমল। বৌদির একী চোখের দৃষ্টি। ভাষাহীন মৃত মাছের মতো।

একমুহূর্তে সব বুঝতে পারলো কমল। আর দাঁড়ালো না। জামাটা গায়ে দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে পড়লো।

রাজপথ।

আগুন জলে যাচ্ছে ওর মাথায়। বাড়িতে রান্না চাপেনি। নেই-নেই -নেই। কেন? ও!···দাদার চাকরীটি বন্ধ। অফিসে পূর্ণ হরতাল। মাইনে নেই!

ক্ষুধা—ক্ষুধা—ক্ষুধা!

ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো ছুটতে আরম্ভ করেছে কমল।

পদ্ম ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে বারান্দার ওপর!

অঝোরে আজ অনেকদিন পরে কান্নার বান ডেকেছে ওর।

আজ বাড়িতে হাঁড়ি চাপেনি। এ বস্তুটা ওর কাছে কিছু নতুন নয়। তবে অনেক দিন ভুলে গিয়েছিলো ও। হঠাৎ পুরানো রূঢ় বাস্তবটা ঠেলে উঠে ঘা দিয়েছে বৈকী ওর মনে। তবু নিঃশব্দে অহল্যার মতো আঘাতটা সয়ে যেতে পারতো। কিন্তু···ঠাকুরপো এসে ওর মনের আগলকে ভেঙে দিয়ে গেলো। কী রকম শুকনো মুখে ছুটতে ছুটতে মানুষটা খাবারের কথা বললো! পদ্ম কোনো উত্তরই দিতে পারেনি মূঢ় বেদনার আতিশয্যে। তবু ওর চোখের দৃষ্টিটা কী খুবই স্পষ্টতর হয়ে পড়েছিলো ঠাকুরপোর কাছে! কী রকম শক্ পেয়ে ঠাকুরপো আর ফিরে দাঁড়ালো না। তীর বেগে ছুটলো।

পদ্ম আজ কাঁদবে। হ্যাঁ—ওকে এখন কাঁদতেই হবে। এ ছাড়া এখন আর মনকে বশে আনবার কোনো উপায় নেই। জমাট ব্যথাকে মেঘের মতো এমনি করে বর্ষণ করে হালকা করে দেবে। না, আর পারে না!

বহুক্ষণ ধরে কাঁদলো ও। মুখে আঁচল গুঁজে, চিঁথিয়ে-চিঁথিয়ে, অনেকক্ষণ।

তারপর সহসা মেঘ চিরে সপ্তবর্ণের এক উজ্জ্বল রামধনু ফুটে উঠলো।

···বিচিত্র লোক। এক রাশ মেয়ে পুরুষ। মিছিল। লাল লাল

নিশানা···আগুনের মতো জ্বলছে পত্ পত্ করে—এক-দুই তিন···লক্ষ কণ্ঠের সমুদ্র গর্জন···বলিষ্ঠ, জীবন্ত—'ভাত কাপড় রুটি দাও···'

মিছিলটা যেন পুরানো মমতায় ডাকছে ওকে, হাতছানি দিচ্ছে, ইশারা করছে।

ওরাও খেতে পায় না। ইশ, কতো লোক খেতে পায় না। অভাব—অভাবের সমুদ্র। মিছিলের মেয়েগুলোর সংগে তো ওর আর কোনো প্রভেদ নেই! সবাই এক। একই আগুনে পুড়ছি—একই অভাবের সমুদ্রে সাঁতরে মরছি। কেউ খেতে পায় না। ওর স্বামীর অফিসের লোকগুলোও এমনি করে না-খেয়ে পড়ে আছে, ওদের মা বউ, ভাই বোন, ছেলে মেয়ে···

না: অবাক বিস্ময়ে কান্নায় প্রোত থমকে পড়ে পদ্মর।

এতো অভাব দেশজুড়ে! কেউ খেতে পায় না! তবে খায় কারা? ও! মনে পড়েছে মদনদারা! ওরা সুখী—ওদের বাড়িতে কী জাগ্রত শিবলিংগ···নাকি লগ্ন দেয় মদনদার বাপকে: অনেক ধন-দৌলত···মাঠভরা গোলা-উপছে লক্ষীর অকৃপণ খয়রাতি! - ওদের অভাব নেই, দুর্ভিক্ষ নেই, মিছিল নেই, চীৎকার নেই! চাকরীরও কোনো পরোয়া করে না ওরা। ওরা সুখী, লক্ষ্মীমন্ত, কুবের ভাগ্য···

কেন এমন হয়? একদল লোক খেতে পাবে, সুখী হবে, আর একদল···!

ওরা ধনী—আমরা গরীব। তাই ওরা দুর্ভিক্ষের সময়ে শহরের ব্যাপারীকে ধান বেচে কোঠা বাড়ি বাড়ায়। কেন পারতো না মদনদারা বাড়তি ধানগুলো ভুখা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে? কেন, তা কি হয় না?

পদ্মর মনে হয়: বোধহয় তা হয় না! মদনদার সংগে যেন কোথায় একটা বিরাট ফাটল আছে ওদের। সেই ফাটলের ওপর দিয়ে

সম্ভবত কোন সেতুবন্ধন চলতে পারে না! তাই তো রাস্তায় ক্ষুধিত মানুষেরা একজোটে বেরিয়ে পড়ে, মিছিল করে, আওয়াজ তোলে, দাবী জানায়!

দাবী!…এই কথাটা যেন কিছুতেই বুঝতে পারে না ও। দাবী—কে মানছে এই দাবী! কেন মানবে? খেতে না পাওয়ার জন্য তো অন্য কেউ দায়ী নয়! আমাদের অদৃষ্ট, ভগবান! সকলের টাকা থাকে না! চাকরী নেই, জমি নেই, জোত নেই…!

আবার এখানে হোঁচট খায় ও।

অনেকক্ষণ একটা এলোপাথাড়ি অস্থিরতা তোলপাড় করে ওঠে মগজে। সহসা—ভাবনাকে একটা সড়কে চালিয়ে দেবার আলো পায় ও। ঠাকুরপোর কাছে কয়েকদিনে শোনা দীর্ঘ, প্রবাহমান কাহিনী!

ঠাকুরপো বলছিলো: 'স্বাধীনতার লড়াই এখনো শেষ হয়নি। দেশের সাধারণ জনসাধারণ এখনো খেতে পায় না। পরনে কাপড় নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই—'

পদ্ম বলেছিলো: 'বারে! হিন্দু মুসলমানের চাহিদা মতো নিজের নিজের স্বাধীন দেশ পেলো। এবার থেকে সকলে খেতে পাবে। চালের দাম আজ চড়ে আছে, শীগ্রি দর নেমে যাবে।'…

কমল বলেছিলো, 'না বৌদি। স্বাধীনতা পেয়েছে আজ ধনীরা। জমিদার-মহাজন আর কলকারখানার মালিকরা। ওদের বেশি লাভ আর মুনাফা লুটবার জন্যেই শুধু চালের দাম নয়, জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই দাম আগুন!'

'কিন্তু সরকার?'

'সরকার ওই ধনীদেরই। ধনীদের সরকার ধনীদেরই তুষ্ট করতে ব্যস্ত।'

'তাহলে—'

'সরকারকে ধ্বংশ করতে হবে। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পথে তা হবে না। ওদের হাতের ক্ষমতা ওরা বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেবে না। তাই'…

তাই যারা বাঁচতে চায়, খেতে-পরতে চায়, তাদের অবিশ্রান্ত লড়াই করে যেতে হবে। জীবনে দর্শকের ভূমিকা নেই!

পদ্মর মনের মেঘে আবার সেই রামধনুটা আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো।

…মিছিল।

পদ্ম সহসা টান হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে প্রস্তুত হচ্ছে, মিছিলে ওকেও অংশ নিতে হবে। দাবী করতে হবে পেট-ভাতের। না, আর সয় না ওর। বাপের বাড়িতে চিরদুর্ভিক্ষের আক্রমণে পর্যুদস্ত, বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ওর জীবন, শ্বশুরবাড়িতেও সেই পুরনো ভাগ্যকে আর মেনে নেবে না ও। আসুক এবার মিছিল—মিছিলের জনতার মধ্যে মিশে আওয়াজ তুলবে ও। হ্যাঁ ঠিক।

রাত্রি।…

ঝড় জল বৃষ্টি-মেশা রাত্রি।

দুর্যোগের ঘনঘটায় পৃথিবী ঢেকে আছে!

কমল ভাবছে: অসহ্য এই মাধ্যবিত্তিক পরিবেশে জীবন কাটানো। দুই দৈত্যের মধ্যে দোদুল্য ত্রিশংকুর মতো অবস্থিতি। জানি: বিপ্লবের মাঝামাঝি কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্ত ধ্বংসের জন্যেই। ধ্বস-ধরা চরের ওপর মৃত্যুর অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা আত্মহত্যার সামিল। তবু…মানুষ বোঝে না—জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটাবার পাগলামি করে। ছিঁড়েখুঁড়ে রক্ত বেরোয় তবুও। বাড়ির এ পরিবেশে কী মানুষ সুস্থ থাকতে পারে। চিরস্থায়ী অনাহার আর দারিদ্র্য।

নেই—নেই—নেই! বৌদির মুখের চেহারা কয়েকদিন থেকে কেমন থমথমে আর কঠিন হয়ে উঠেছে। সেখানে কিসের ঝড়ের আলোড়ন? বিদেশী-বিদেশী হাবভাব!···দাদা বেইমানির সাজা নিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। দিন রাত। বাবা নির্বাক পাথর, ঘরে বসে বসে জমাট বেঁধে গেছেন। আর দিদিমা···? নাঃ এখনকার জীবন বড়ো পিছু টানে। মধ্যবিত্তের মরচে-ধরা রক্তে টালবাহানা ধরায়। এখানে সমস্যা আছে রাশি রাশি, সমাধান নেই! সমাধান হবে কী করে। ইতিহাস পরশুরামের কুঠার—তার রায়কে মানতেই হবে। মেহনতি শ্রমিক মানুষদের মধ্যে নেমে আসতে হবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব গুঁড়িয়ে—সেইটেই একমাত্র বাঁচার পথ। ধনিক শ্রেণীর দালালি—? সাময়িক প্রয়োজন মিটলেও, ভবিষ্যত তাদের জন্যে অন্ধকারাবৃত, নির্মম, নিষ্ঠুর! ···কী করবে ও? না আর পারছে না। মধ্যবিত্ত পরিবেশকে ফেলে ছুঁড়ে এগিয়ে যেতেই হবে। শ্রেণীচ্যুত না হয়ে উপায় নেই!

কমরেড সিদ্দিক ভাবছে: নির্জন সেল···উটের মতো কুঁজ-তোলা কারা প্রাচীর। মোটা মোটা তার-ছাওয়া জানালার গরাদ।······ কয়েদীরা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন—কিসের স্বপ্ন? কবে মুক্তি আসবে!···ওয়ার্ডারের বেসুরো বুটের খট খট কম্পাউণ্ডের এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসছে! ঢং করে রাত একটার ঘন্টা বাজলো। ঘুম নেই চোখে ওর। অভস্র ঝড়—ঠাণ্ডা রাত্রি।

···আজো রক্ত উঠেছে। ঘুম থেকে উঠেই কাশি—একঘেয়ে খরখরে; তারপর মুখ ভর্তি একদলা রক্ত। লড়নেওলা ইস্পাতের মতো মজবুত শ্রমিক-নেতা কমরেড সিদ্দিক। লড়াইয়ে ঘায়েল করে ফেললো ওকে, জখম হয়ে গেলো। কবে মরবে? লাল পৃথিবীকে দু চোখ ভরা মমতায়

দেখে যাবার কী সময় পাবে না? না :—এ দুর্বলতা, লড়াইয়ে মানুষ খুন হবেই। মরবেই। মরছেই তো কতো বুলেটে আর ফাঁসীর মঞ্চে—লক্ষ লক্ষ গ্রাম, হাজার হাজার শহর-এলাকা। কতো রক্ত, কতো রক্ত-খিন্ন লাশ। আরো মরবে—কিন্তু একদিন মৃত্যুরও খতিয়ান শেষ হবে। ওদেরও আমরা মারবো, মারছি···নির্মূল করবো রক্ত-খেকো শয়তানদের।

দাঁত কড়মড় করে ওঠে ওর। কিন্তু এতো শীঘ্র সংগ্রামী দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে! আচ্ছা, কেমন হবে সেই লাল দুনিয়াটা!···খাটবো—খাবো। লোভের জন্যে নয়, মুনাফা লুটের যন্তর হিসেবেও নয়। বলিষ্ঠ ছেলে মেয়ে···জীবনের প্রেম—প্রাচুর্য, আনন্দ, হাসি। রুমিয়ার মুখখানা কেন যেন ভেসে উঠছে আজ ওর চোখের ওপর। মিস্ত্রী রমজানের লেড়কী। কালো—শামলা মেয়েটী, গোরুর মতো শান্ত দুটো চোখ, কী সরম আর লজ্জা! আঁখি তুলে কথা কইতেই পারতো না। লাজে ওর কালো মুখ বেগুনি হয়ে উঠতো। লাল দুনিয়ায় কী শক্ত করে পাশে টেনে নিতে পারতো না রুমিয়াকে।

সিদ্দিক ঘামতে থাকে। গলার ভেতরটা খুশখুশ করতে থাকে।

···কিন্তু আজ সকালেই বাজ পড়েছে যেন ওর মাথায়।

ওকে দিন কয়েকের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। টি. বি-র জন্যে একলা করে রাখা হয়েছে ওকে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অনেক পরীক্ষা চললো। শোনা গেলো : সিভিল সার্জন নাকি রায় দিয়েছে টি. বি. ফি. বি কিছু নয়। স্রেফ ঝুটা! স্পুটামে জার্ম পাওয়া যায়নি! টাকা খেয়ে অদ্ভুত মিথ্যে কথা বলতে পারে ওরা!

হাসি পায় সিদ্দিকের দুঃখের মধ্য দিয়েও। সব কটা শেকলই এক যন্ত্রের চাকায় বাঁধা—সমস্বরে বিনীতভাবে কেমন মাথা নোয়ানো—হুঁকে হুঁ-বলা!

যক্ষ্মা হয়নি—বেশ তো। শাস্তি দিক, জেল খাটাক। কিন্তু সরকার

বড় দয়ালু! সিদ্দিককে মুক্ত করে দেয়া হবে। মরুক লোকটা তিলে তিলে অন্ধকার বস্তিতে বসে। মুমূর্ষু শত্রুকে আটকে রাখলে চিকিৎসের খরচ পোয়াতে হবে!...তাই বিনা ওজোরে, ওর বিরুদ্ধে সমস্ত চার্জ তুলে নিয়ে, বেকশুর খালাশ দেবে ওকে। তবে...বিধিনিষেধ থাকবে একটা। শহরে থাকতে হবে—সূর্য অস্ত থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত ঘরে আটক থাকতে হবে। কোনো আইনী বা বেআইনী আন্দোলনের মধ্যে থাকা চলবে না, অবাঞ্ছিত লোকদের সংগে সম্পর্ক থাকবে না কোনো। দরকার হলে হপ্তায় একদিন থানায় হাজিরা দিয়ে আসতে হবে।

খক-খক-খক। কাশি ওঠে।

ঝম ঝম করে একটানা বৃষ্টির আর্তনাদ।

শিবানী ভাবছে: বিছানার ওপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো এতোক্ষণ। বিস্রস্ত কাপড় এলোমেলো হয়ে লুটোচ্ছে মেজের ওপর, সেমিজটা ছেঁড়া খোঁড়া, কালো আকুল চুলের বোঝা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। অন্যমনস্ক ভাবে জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে ও।

খোলা জানালা দিয়ে মোটা মোটা হিংস্র বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে ঘরের মেজেতে। জলে সপ্‌সপ হয়ে উঠেছে মাথার দিকের বিছানাটা, ভিজে চুলের গন্ধ।

থাক। জানালাটা খোলাই থাক।

কান্না কোনো একটা সমাধানই নয়। তাই কান্না থামিয়েছে ও অবশেষে।

...আজ এক মাস ধরে শুধু প্রতারণা করেছে মিঃ বসু। জীবনের স্বচ্ছলতা...সিনেমার ষ্টার! এক রাত্তির নয়—অনেক রাত্তিরই ভাড়া খাটিয়েছে দেহকে। দিনের পর দিন কেবল প্রতিশ্রুতি থেমে থেমে

চলেছে। 'হবে—হবে। ব্যস্ত কেন···লিখেছি তো!' নিঃশেষে টুকরো টুকরো করে বিলোনো মাংসে বেঁধে ফেলা জীবনকে কুকুরের মতো। পাগল হয়ে উঠেছে ও। আজ রাত্তিরে একটু আগে চরম উত্তরের জন্যে গিয়েছিলো ও মিঃ বসুর কামরায়।

আজকে প্রস্তাব করেছে মিঃ বসু। নতুন প্রস্তাব! 'তারচেয়ে এই ভালো! থাকো না তুমি আমাকে নিয়েই—যতোদিন ইচ্ছে। অভাব? একেবারে মুছে যাবে: মিঃ বসু ইজ নো চিট্। টাকা দেবো দিল খুলে!'

জ্বলে উঠেছে শিবানী বুলেট খাওয়া বাঘের মতো। 'আপনি বলতে চান কী? আপনার কেপ্ট হবো···' থরথর করে উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছে ও। 'পশু···লম্পট!'

হাহা করে হেসে উঠেছে মিঃ বসু। 'ইউ আর ষ্টিল এ চাইল্ড শিবানী!···বাড়ি যাও—হাভ পেসেন্স—ভেবে দেখো—'

ঝড়ের গর্জন। চাপা-পড়া আহত শ্বাপদের গোঙানি। বিদ্যুতের সাপ। বাজের হুহুংকার। ঝর ঝর ঝর। জল ঝরছে।

পথ?

চিরঞ্জীব ভাবছে: অনিয়ম আর অত্যাচারের নিশানা উড়ছে দেহের দুর্গ ঘিরে। রক্তহীন বিবর্ণ মুখ, রুগ্ন হলদে চোখের প্রান্তে কলংকের দাগ, বিদ্রোহ করে চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠতে চায়।

হাতের নাগালে মদের গ্লাশ। দিশী মদের সৌরভ।

···পাপড়ি দে আর আসে না। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। পাপড়ির এই চলে যাওয়াকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পেরেছে ও। 'Love is like a flower, it must fade!'···হা হা—হাসি আসে ওর।

প্যাপড়ি দে-র চিরবিদায়! চিনেছে পাপড়িকে তন্ন তন্ন করে! বাইরেটা যত্তোই দুঃসাহসিক কায়দায় সাজিয়ে তুলতে চাক না কেন, চিরঞ্জীব পরিচয় পেয়েছে, মোটেই দুঃসাহসী নয় ও। তার ঝকঝকে পোশাক আর উন্নত দেহ-বল্লরীর বাঁধনের নিচে একটি দুর্বল হৃদয় ধুকপুক করছে। তুলে নাও বহির্বাস, ছিঁড়ে ফেলো চামড়ার আস্তরণ—ধরা পড়বে ওর দেউলেপনা। হ্যাঁ: বেশ নিখুঁতভাবে জেনে ফেলেছে। আর আসবে না পাপড়ি। ভয় পেয়েছে ও।

মদের গ্লাশটা টেনে নিলো চিরঞ্জীব।

...ভালোই হয়েছে। A happy ending! চিরঞ্জীব স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। বিস্বাদ, বিবর্ণ হয়ে গেছে পাপড়ির সান্নিধ্য। Grapes are sour নয়—অতিবিক্ত আঙুরের রস তেতো হয়ে গেছে।

চিরঞ্জীব মুখ বিকৃত করে।

'...কবি চিরঞ্জীব—বিপ্লবী চিরঞ্জীব। তোমার মনের অশান্ত আগুনকে ছাই করে ফেললে চলবে না। তোমাকে সৈনিক হতে হবে!'

কে বলেছিলো এ কথা? কমল? হ্যাট্ পেডান্টিক ননসেন্স!

নাঃ একটা হাতুড়ি বাগিয়ে ধরে মস্তিষ্কের পোকাটাকে কী ঠাণ্ডা করা যায় না? পেছনের মরা ইতিহাস কেন হাতছানি দিয়ে ডাকে? কেন —কেন—কেন? যা চলছে তাই সত্য—অতীত ডিফাংকট, ভবিষ্যত ব্যাঙ্কক্রাপ্ট।...A dead man never returns! চিরঞ্জীব মদ খাবে।

দিন কাটে।

চৈত্রের পত্র-ঝরা দিনগুলি। ধূসর পাণ্ডুর জীবনের অনেক পাতা ঝরে পড়ে। নতুন করে সাজবার জন্যে আয়োজন ওঠে আকাশে বাতাসে।

বসন্ত আসে। লাল আগুন বনে বনে।

বসন্ত···

মহানন্দা ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে চলে।

ইতিহাসের ঊর্ণনাভ জাল বুনে চলে।

তারপর শহরের জীবনে সে-এক বিশেষ ঘটনা।

দক্ষিণ বাতাসে ধুলো উড়িয়ে ঘুনি উঠলো·

লাল মেঘে ছেয়ে গেলো দিকদিগন্ত।

গাঁ উজোড় করে লক্ষ লক্ষ জনতার শোভাযাত্রা। কালো কালো বলিষ্ঠ মেয়ে পুরুষ। শক্ত শক্ত রাজবংশী, দেশী চাষী-সমাজ। আর আরণ্যক বিদ্রোহী সাঁওতাল বংশ। হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি, কারু হাতে কাস্তে, তীর ধনুক। আঁটো আঁটো কিসানী মেয়েমহল, খাটো করে পরা শাড়ি, বুকের সংগে ছোটো করে গামছার বন্ধন। কোলে কাঁখে ভোঁতা নাক, চ্যাপটা চোখমুখ দিগম্বর মানুষের বাচ্চা। পা ভর্তি ধুলোর পুরু প্রলেপ। রুখু নারকেলের ছিবড়ের মতো কর্কশ কালো চুলগুলো আগুনের শিখার মতো কাঁপছে।

রোদ উঠেছে সোনার মতো।

জ্বলছে অভিযাত্রীদের চোখমুখ, দাঁতগুলো ধারালো কাস্তের মুখের মতো ঝকঝক করছে। চোখে মুখে ধৈর্যহীন আক্রোশের জিঘাংসা।

কাঁপছে রক্তের নিশানাগুলো। বুকের উজোড় করা লাল শোনিত ভিজিয়ে তৈরী হয়ে উঠেছে ওই পতাকার জমি।

হরিনখালির ঘা খাওয়া ভুখা চাষী···বন্দুকের গুলিতে কতো লাশ ধান খেতে মুখ বুঁজে শয্যা নিয়েছে। জমির দখল ছাড়েনি তবু। নেকড়ে বেইমানদের আক্রমণে সারা হরিনখালির ওপর দিয়ে ভূমিকম্প বয়ে গেছে। ঘরবাড়ি তছনছ···একটি চালাও মাথা তুলে নেই—পোড়া বোঁটকা গন্ধ শ্মশানের অধ্যায় এঁকে দিয়েছে সেখানে। বেয়নেটের খোঁচায়, বুটের

লাথিতে ভেঙে দিতে চেয়েছে চাষীদের হৃদপিণ্ড, মারতে মারতে হ্যাংটো করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সারা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে শহরের জেলখানায়। লাথির চোটে মুখে রক্ত তুলে দিয়েছে ছোট ছোট শিশুদের— ওদের মায়ের কালো চোখের দৃষ্টির সামনে।

ডাকাতদের ধরাতে হবেই! বলো—কোথায় আছে ভগমান দেশী, কোথায় আছে লবকেষ্ট মাঝি, কোথায় আছে জিতু সাঁওতাল।

পাথরের মতো অত্যাচারকে প্রতিহত করেছে মেয়েরা। ডাকাত! কারা ডাকাত?···ওদের মরদ, বাপ ব্যাটা—ওরা ডাকাত!···কেন! ওরা খেয়ে বাঁচতে চেয়েছে! জমির বেবাক ধান নিজেদের খামারে তুলতে চেয়েছে। 'ক্যানে—ক্যানে তুইলবে না? খাবা হবেনি, বাঁচবা হবেনি হামাদের? তামাম জীবন এমনি কইরা ভুখা কাটাবা হবে।'

ফুঁশে উঠেছে জনতা 'জমিকুনাত্ চাষ করি হামরা—খাবে উই লোকনাথ জমিদার! ক্যানে—ক্যানে? হামাদের ভুখ নাই, পেট নাই!···না ই আর সয়না! মানবো নাই হামরা ই কানুন। কানুন কী বদলাইবে না!'

পাথরের প্রাণ আছে। অবিচার আর জুলুম তলে তলে লাভাস্রোত জমিয়েছে ওদের বুকের তলায়, চরম বিস্ফোরণে আজ ফেটে পড়েছে সেই অসন্তোষ। অত্যাচারের শেষ আছে। আজ ওরা মরিয়া হয়ে গেছে। কতো—কতো ওদের বুলেটের শক্তি, ওদের লোহার খুরের দাপট, একবার মুখোমুখী ময়দানে পরখ করতে চায়।

হরিনখালি থেকে এসেছে চাষীরা, সোনাঘুঘু, বংশীবাটি, রতনডাঙা— আশেপাশের সব গ্রাম ভেঙে এসেছে জনতার দুর্মদ স্রোত।

—হত্যাকারীর শাস্তি চাই—

শহরের ধমনীতে রক্ত জমে গেছে। উদ্বেগ আর আশংকায় দুরদুর করে উঠেছে বুক।

এবার আর দুর্ভিক্ষের তাড়নায় শহরের ফুটপাথে নিঃশেষে ফুরিয়ে আসতে আসেনি ওরা। ফ্যানের বিন্দুমাত্রও প্রত্যাশী নয় ওরা! জমিতে ওদের সোনালী ধানের অফুরন্ত উচ্ছাস। সে ধান একমাত্র ওদের। ইতিহাস বদলেছে, পুরানো আইন কানুন খতম।

ধুলো-ওড়ানো লাল পথটা পদক্ষেপে কাঁপছে।

মোটর ট্রাক রিকশা এক জায়গায় জমে গেছে। ফুটপাথে পথচারী নির্বাক।

দোকান পাটের ঝাঁপ আধা বন্ধ হবার উপক্রম করেছে।

দোতলা তেতলা থেকে জানালাগুলো খুলে গেছে। সারি সারি মুখ, উদ্বেগ আর আশংকায় কন্টকিত।

পথের মোড়ে ধর্মঘটি কেরানীরা অপেক্ষা করছিলো।

মিছিল কাছে আসতেই মিশে গেলো ওরা জনপ্রবাহের সংহতিতে।

পদক্ষেপে ঘোষণা তুলে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা।

দত্ত বেকারীর পিকেটিং-রত মজুরেরা দল বেঁধে বেরিয়ে এলো মিছিলকে অভিনন্দন জানাতে।

ঝড় উঠছে···রক্ত-লাঞ্ছিত পতাকা···

ইস্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট ডেকেছিলো হরিনথালির প্রতিবাদে। চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রার সংগে দেখা হয়ে গেলো।

শ্যামলী আওয়াজ তুলেছে···

জবাব দিচ্ছে সকলে।

সুদীর্ঘ মিছিল এগিয়ে চললো আরো।

গলির মোড় থেকে টলতে টলতে মদের বোতল বগলে বেরোচ্ছিলো চিরঞ্জীব।

উঃ কী চীৎকার! এতো চীৎকার কেন!

থমকে দাঁড়ালো বড়ো রাস্তার মাথায়! মদের বোতলটা বগল থেকে আলগা হয়ে খশে পড়লো। চোখ টান করবার চেষ্টা করছে চিরঞ্জীব। জামার হাতায় মুখ থেকে ফেনাগুলো মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো। পা টলছে। পায়ে জোর পাচ্ছে না কেন!…

কতো—কতো ওরা? উঃ শেষ নেই! নাঃ ভালো লাগছে না ওর। পালাতে চায়। কিন্তু পালাবে কী করে। সামনে জনতার সুদৃঢ় সচল প্রবাহ। এগোতে গেলেই মিশতে হবে ওদের সংগে।

চিরঞ্জীবের মাথায় বিস্ফোরণ শুরু হয়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে চোখের সামনে দুলে দুলে যাচ্ছে মিছিলের মুখগুলো, বজ্রমুষ্টিগুলো, লাল-লাল নিশানাগুলো।

শেষ নেই মিছিলের? আরো—কতো, কতো…

নাঃ আর দাঁড়াতে পারছে না চিরঞ্জীব.। মদের নেশা ছুটে গেছে একেবারেই। প্রকৃতিস্থতা ফিরে আসছে ওর রক্তে। আর দাঁড়াবে না—এগোবে! যা হবার হোক।

ঘরে নীল বাতিটা জ্বালিয়ে নিলো পাপড়ি দে।

অন্ধকার করে আসছে ঘরটা।

এলিয়ট মাথার মধ্যে গুঞ্জন তুলেছে ওর।

Because I do not hope to turn again

Because I do not hope

Because I do not hope to turn

Desiring this man's gift and that man's scope

I no longer strive to strive towards such things

(Why should the aged eagle stretch its wings ?)

Why should I mourn

The vanished power of the usual reign ?

Pray for us now and at the hour of our dead……

রূপক কখন পেছন থেকে এসে আঁকড়ে ধরেছে ওকে। রূপক চৌধুরী। জুনিয়ার ল-ইয়ার…

পাপড়ি হেসে উঠলো চিরাচরিত প্রথায় : 'ইউ নটি বয়। ছাড়ো—'

রূপক ওকে টেনে নিয়েছে হাঁটুর কাছে। কামড়ে ধরেছে ওর ঠোঁট। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ছিঁড়ে খাবার চেষ্টা করছে ওর লিপস্টিক-লেপা আধো-আধো ঠোঁটকে।

পাপড়ি হাসছে। হি হি করে।

চীৎকার ভেসে এলো উদ্বেগ জনতার।

'ছাড়ো—ছাড়ো দেখি—'

পাপড়ি উঠে এলো জানালার কাছে। পর্দাটা সরিয়ে দিলো।

কালো কালো মাথা, ময়লা মুটে মজুর। হল্লা করছে। উঃ কী চেঁচাতে পারে চাষা লোকগুলো !

' রূপক—দেখবে এসো—'

রূপক ছুটে এলো।

'আবার মিছিল ! রাস্কেল লোকগুলো জ্বালালে দেখছি !'

'কী বলছে ওরা শোনোতো ?'

'আর কী ! ভাত কাপড় দাও ! হামবাগ্‌স !'

'দেখেছো ইস্কুল কলেজের ছাত্ররাও আছে। আরে ওইযে শ্যামলী…'

'চলো এসো—Let the dogs bark…'

নীল বাত্তিটা মরার হাসি হাসছে।

মিছিল ঘুরছে।

জ্বরের ঘোরে চমকে-চমকে উঠছে পদ্ম। ভুল বকছে।

'কে ?···ঠাকুরপো ভাই—মিছিল আসবে না আর···আমি যে আর পারিনে···উঃ মাথায় আগুন জ্বলে যাচ্ছে···মিছিল কবে আসবে ভাই, কবে···?'

দ্বিজনাথ বেরিয়ে পড়েছে বারান্দায়।

মিছিল আসছে। আওয়াজ উঠছে!

'কী করবো—কী করবো আমি! ···ঘরে পালাবো? না··· আসুক, আসুক মিছিল। কিন্তু···আমাকে ডাক দেয় যদি! যাবো, যাবো আমি। ···আমাকে নেবে ওরা? ···কমল কোথায়? ওকে জিগ্যেস করলে একটা নির্দেশ পাওয়া যেতো···'

মিছিল এগিয়ে আসছে।

'ও কী কিসের আওয়াজ!'

বিকারের ঘোরে উন্মাদের মতো উঠে এসেছে পদ্ম। একেবারে সোজা বারান্দায়।

চোখের সামনে রামধনু রং ছড়িয়েছে ওর।

···মিছিল। মুষ্টিবদ্ধ নর-নারী। দাবী তুলছে, চীৎকার করছে।

এসেছে, এসেছে মিছিল! মাথা ঘুরছে পদ্মর, বুক থেকে একটা বিবমিষা ঠেলে উঠতে চাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে পদ্মর, দ্রুত ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস বইছে, ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক।

পদ্ম চীৎকার করে উঠলো: 'আমি যাবো—ঠাকুরপো কোথায় তুমি—'

এগোতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়লো পদ্ম।

শব্দে ফিরে তাকালো দ্বিজনাথ: 'একি! বউমা!'

পদ্ম মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। কপালের কাছে কেটে গিয়ে সূক্ষ্ম এক

টুকরো রক্তের ধারা দেখা দিয়েছে ওর। হাতের মুঠো দুটো প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিজনাথ বউমাকে ছুঁতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। তাইতো! বলাই নেই বাড়িতে। কেউ নেই! দ্বিজনাথ ধরাধরি করে কোনোরকমে পদ্মকে এনে ভেতরে শুইয়ে দিলো।

এবারে রাস্তার মোড় ফিরতে থমকে দাঁড়ালো মিছিল। কিছুক্ষণ। আবার চলতে লাগলো ধীরপায়ে। জমাট বেঁধে।

ওধারে রাস্তা আটক করে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে হেলমেট-পরা সৈন্য। সারি বেঁধে, কাঠের পুতুলের মতো। বেলা শেষের লাল সূর্যের আভা পড়েছে ঝকঝকে বেয়নেটের মুখে। রক্তশোষকের জিভগুলো যেন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

রিভলভার বাগিয়ে ধরে পুলিস-অফিসার। হুকুম দেবার জন্যে তৈরী।

'কমলভাই!' ইসমাইল হাসলো এগোতে এগোতে।

'কমরেড—' ইসমাইলের হাতটা কমলের হাতের ওপর।

শ্যামলীর চোখটা আকুল জিজ্ঞাসায় একবার মিছিলের এদিক-ওদিক ঘুরে এলো। এই সময়ে একবার কমলকে দেখা যায় না! একটিবার শুধু কমলের হাতের উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে বলবে, 'কমল—আজকের দিনে উচ্চারণ করতে দাও দুটি কথা—আমি তোমায় ভালবাসি—

রাইফেলগুলো এবার বাঘের চোখের মতো জলে উঠ[illegible]

চঞ্চল হয়ে পড়লো পুলিস অফিসার।

এগিয়ে আসছে মিছিল। লক্ষ লক্ষ কালো কালো মুখ, [illegible]র চো[illegible]

পতাকাগুলো কাঁপছে, আওয়াজ উঠছে সমুদ্রের গর্জনের মতো।

পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। লাল আলোয় গ্রাস করেছে মিছিলে[illegible]

ওদের মুখ পূর্বের দিকে।

বেয়নেট আর মানুষের বুকের দূরত্ব প্রতি পদক্ষেপে কমে আসছে॥